মাসুদ রানা

রক্তলালসা

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

রক্তলালসা

রানা বুঝল বাঁচার কোন পথ আসলেই নেই। অন্যদের কথা চিন্তা করে মরতেই হচ্ছে ওকে। সিদ্ধান্ত নিয়ে প্লেন থেকে লাফিয়ে পড়ল, চিৎকার করে বলল, 'গেট দ্য থিং অভ, ম্যান! এখনও সময় আছে, পালাও! আমার কথা ভাবতে হবে না।'

রানওয়েতে একা দাঁড়িয়ে আছে গুলিবিদ্ধ রানা, পিছন থেকে তেড়ে আসছে কর্নেল টোগো। মৃত্যু এখন কেবল সময়ের ব্যাপার!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা - ৩১০

রক্তলালসা

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ মাসুদ হোসেন রানা

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

রক্তলালসা

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

এক

বাংলাদেশী পাসপোর্ট দেখে একটু বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠল কাস্টমস অফিসার দৃষ্টি দিয়ে রূপাকে আরেকবার নির্লজ্জের মত চাটল। তারপর যেন দয়া করছে, এমনভাবে মাসুদ রানাকে দেখল। 'কিমশাকায় আপনাদের আসার কারণ?' থেমে থেমে, ইংরেজি জ্ঞানের ভাণ্ডার হাতড়ে প্রশ্ন করল তেল চকচকে, নাদুস-নুদুস মানুষটা। প্রায় মাঝবয়সী সে। দেখলে মনে হয় কারও ওপর রেগে কাঁই হয়ে আছে।

'আপনাদের দেশটা ঘুরে দেখা,' মিষ্টি হেসে বলল ও। যদিও বুঝল, অদৃশ্য কোন দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছে হাসিটা। 'আপনাদের রিচ ওয়াইল্ডলাইফের ভিডিও করারও ইচ্ছে আছে।'

'কতদিন থাকার ইচ্ছে?' জিনস্, টী-শার্ট পরা উদ্ভিন্ন যৌবনা রূপার বুকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল অফিসার।

'অন্তত এক সপ্তা,' রূপা জবাব দিল। 'নির্ভর করে...'

'কিসের ওপর?' কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল সে।

'আমরা আসলে হারারেতে এসেছিলাম ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের একটা প্রজেক্টে কাজ করতে,' রানা বলল।

'তো?' আবার বাধা।

ঠাস্ করে ব্যাটার ফোলা গালে এক চড় বসিয়ে দিল ও, মনে মনে যদিও। শালা ভারী অভদ্র তো! অনেক কষ্টে রাগ দমন করল। 'এ মুহূর্তে প্রয়োজনীয় ফান্ডের অভাবে কাজ বন্ধ আছে। তাই বসে বসে সময় নষ্ট না করে আপনাদের দেশটা ঘুরে দেখব ভেবে এসেছি।'

'ফান্ডের অভাব হলেই বুঝি মানুষের ঘুরে বেড়ানোর শখ জাগে?' গা জ্বালানো একটা ভঙ্গি করল লোকটা। রানার পাসপোর্ট খুলে চোখ বুলাতে লাগল। দুই কি তিনটা পৃষ্ঠা উল্টেই ভেতরে ভাঁজ করে রাখা একটা একশো ডলারের কড়কড়ে নোট দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেল ব্যাটার।

এক মুহূর্ত পর চট্ করে রানাকে দেখে নিল ব্যাপারটা ইচ্ছেকৃত কিনা বোঝার জন্যে। ওর মুখে মৃদু হাসি দেখে যা বোঝার বুঝে নিল। অমনি কোথায় গেল তার রাগ আর কোথায় কি! সড়াৎ করে নোটটা পকেটস্থ করে কাউন্টার কাঁপিয়ে এন্ট্রি সীল মেরে দিল পাসপোর্ট দুটোয়।

যে দেবতা যে নৈবেদ্যে খুশি হয়, তাকে তা দিলে কাজ দ্রুত হয় জানা আছে, তাই নোটটা আগেই ভরে রেখেছিল রানা। কিন্তু ব্যাটা আগের কাজ আগে না করে করল পরে।

'ওয়েলকাম টু কিমশাকা, স্যার। উইশ ইউ হ্যাপি স্টে।'

কাস্টমস শেড থেকে বেরিয়ে এল ওরা। দু'জনের কাঁধে দুটো ট্রাভেল ব্যাগ এবং রানার হাতে বাড়তি একটা ব্রিফকেস, এই হচ্ছে ওদের লাগেজ। সব মিলিয়ে খাঁটি ট্যুরিস্টের মতই লাগছে দেখতে। একদল অপুষ্ট, শিশু-কিশোর ভিখিরি ছুটে আসছে দেখে আঁতকে উঠল রানা। ছুটে এসে গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই দ্রুত উঠে পড়ল সবচেয়ে কাছের অপেক্ষমাণ ট্যাক্সিতে। মান্ধাতা আমলের একটা ফিয়াট ওটা। বেশ নিচু। ঝক্কর মার্কা।

'কিমশাকা,' ড্রাইভারের উদ্দেশে বলল রানা, 'প্যালেস হোটেল।'

'ইয়েস, স্যার,' গাড়ি ছেড়ে দিল ড্রাইভার। আফ্রিকান নয়, ভারতীয়। শিখ। এদেশের ট্যাক্সি ড্রাইভারদের বেশিরভাগই তাই, তথ্যটা জানা আছে রানার। খোলামেলা প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে ত্রিশ মাইল দূরে রাজধানী কিমশাকা সিটির দিকে ছুটল ট্যাক্সি। দেখে যাই মনে হোক, গাড়িটা চলে ভাল।

চার জানালা দিয়ে আসা আফ্রিকার গরম বাতাসের ঝাপটায় খোলা চুল উড়ছে রূপার। গুন্ গুন্ গান ধরল ও, "আজ কোনও কথা নয় শুধু গান আরও গান..."

'শুধু গান?' চোখ কুঁচকে ওকে দেখল রানা। 'সাথে আর কিছু হলে ভাল হত না?'

'কি?' রূপা অন্যমনস্ক।

'এই...ইয়ে আর কি! গানের সাথে একটু পান, তার সাথে একটু...'

'ভুলে যাও'।'

চেহারা কুঁচকে উঠল রানার। 'তুমি কী, বলো তো? মানুষ, না আর কিছু? এই যে এত বছর ধরে তোমার পিছনে নিরলস টাঙ্কি মেরে আসছি, তবু একটুও দয়া হলো না তোমার, এ কেমন কথা? আচ্ছা, আমার কথা না হয় বাদই দাও। তোমার নিজেরও কি ইচ্ছে করে না, একটু...'

'না, করে না,' সোজা-সাপ্টা জবাব দিল রূপা। 'দয়া করে সামনে তাকাও। ও ব্যাটা আয়নায় দেখছে আমাদের।'

রানাকে নিরুৎসাহিত করার জন্যে ব্যাকপ্যাক থেকে ওয়াকম্যান বের করে কানে লাগাল ও, গান শোনায় মন দিল। হতাশ হওয়ার ভঙ্গি করে সামনে নজর দিল রানা। একটা যাত্রী বোঝাই বাসকে ওভারটেক করে ধুলোমোড়া রাস্তা ধরে ছুটল ট্যাক্সি। প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে চলল ওরা

কিমশাকা বতসোয়ানা ও জিম্বাবুয়ের মাঝখানে সাড়ে আঠারো হাজার বর্গমাইলের ছোট্ট, প্রায় অখ্যাত একটা দেশ। রাজধানীর নাম কিমশাকা সিটি। জনসংখ্যা '৯৩ সালের শেষ আদম শুমারী অনুযায়ী সাতাশ লাখ আটান্ন হাজার সাতশো একাশি জন। শিক্ষিতের হার মাত্র তিন শতাংশ। মাথাপিছু বাৎসরিক গড় আয় তেইশ ডলার। মুসলমান, হিন্দু ও পাঞ্জাবীসহ নানা ধর্মের, নানা জাতের মানুষ আছে এ দেশে। তবে এই গোষ্ঠি তিনটিই সবচেয়ে ধনী। এদের আদিপুরুষ ভারত থেকে এসেছে। দেড়শো বছর ধরে আছে এদেশে।

গত ছয় বছর ধরে সামরিক সরকার শাসন করছে দেশটাকে প্রেসিডেন্টের নাম জেনারেল হ্যারল্ড লুই লগুম্বা।

প্রকৃতি উদার হাতে দিয়েছে কিমশাকাকে। অনেক দামী দামী খনিজ সম্পদে ভরা এ দেশ। তার মধ্যে ডায়মন্ড, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ, বক্সাইট, কপার এবং উঁচু মানের ইউরেনিয়াম অন্যতম। এগুলো প্রচুর আছে এদের, সঠিক পদ্ধতিতে তোলা হলে কিমশাকা হতে পারত আফ্রিকার সবচেয়ে ধনী দেশ। কিন্তু সরকারের খুব একটা খেয়াল নেই এদিকে।

অতীতের সরকার যাও বা একটু একটু কাজ করত এ ব্যাপারে, বর্তমান সরকার কিছুই করছে না।

কিমশাকার আরেকটা দিক হলো এর ওয়াইল্ডলাইফ। এদিক থেকেও দেশটা খুবই সম্পদশালী। প্রচুর পশু-পাখি আছে। তাই সারাবছর ট্যুরিস্ট আর ক্যামেরাম্যানদের ভিড় লেগেই থাকে।

কাস্টমস অফিসারকে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক প্রজেক্টের ব্যাপারে যা বলেছে রানা, তা সত্যি নয়। ওরা আসলে বিসিআইয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে হারারেতে এসেছিল। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক প্রয়োজনীয় ফান্ড জোগান দিতে পারছিল না। জানিয়ে দিয়েছে, দু'সপ্তাহের মত লাগবে টাকা পাঠাতে। এত লম্বা সময় অনর্থক বসে না থেকে নতুন এক দেশ দেখার শখ জাগল রানার। ব্যস্, পরদিনই গাঁটরি-বোঁচকা বেঁধেছেঁদে রেডি হয়ে নিল। রূপাই বা একা পড়ে থাকে কেন? ও-ও পিছু নিল রানার।

রাজধানীর পাঁচ মাইল আগে আধুনিক পাকা সড়কে উঠল ট্যাক্সি। এটা চওড়া, তবে বেশি ভাল নয়, মোটামুটি চলনসই। দু'দিকে পায়ে হাঁটা নারী-পুরুষের মিছিল দেখতে দেখতে চলেছে ওরা। মেয়েদের বেশিরভাগই বয়স্ক, ভারী দেহের অধিকারী। রঙচঙে গাউন পরে আছে। প্রত্যেকের মাথায় কিছু না কিছু বোঝা আছেই। পুরুষরা পরে আছে জিনস্ টী-শার্ট। মলিন অবশ্য। অভাব প্রকট হয়ে ফুটে আছে ওদের চেহারায়, তারপরও সবাই হাসিখুশি।

গল্প করতে করতে হাঁটছে তারা, থেকে থেকে হেসে উঠছে। গাড়ির আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাচ্ছে, হাত নাড়ছে ওদের দেখাদেখি। কালোর মাঝে সাদা দাঁত ঝিলিক মেরে উঠছে একটু পর একটা-দুটো করে পাকা ঘরবাড়ি দেখা দিতে লাগল। সেই সাথে মানুষের উপস্থিতির হারও বাড়ছে।

এক সময় শহর-কেন্দ্রে পৌঁছল ওরা অপরিকল্পিত, যেমন-তেমনভাবে গড়ে ওঠা শহর। কার, বাস-ট্রাক চলছে ইচ্ছেমত. ট্রাফিক পুলিসকে তেমন পাত্তা দিচ্ছে না। অত্যাধুনিক দু'তিনটে শপিং কমপ্লেক্স চোখে পড়ল ওদের। খেলনা, পোশাক-আশাক থেকে শুরু করে প্রসাধন সামগ্রী, অলঙ্কার, ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতি, সবই আছে সেখানে।

কিমশাকার ট্যুরিস্ট গাইড দেখে পছন্দ করা দেশের একমাত্র ফাইভ স্টার হোটেল, প্যালেস হোটেলে পৌঁছল ওরা। ফাইভ স্টার আসলে নামে, থ্রী স্টারও নয় মানের দিক থেকে ড্রাইভারের হাতে ভাড়া ও মোটা বকশিশ তুলে দিয়ে প্রকাণ্ড ফয়েই-এ ঢুকল ওরা।

'রুম একটাই নেব তো?' বলল রানা।

চোখ কোঁচকাল রূপা। 'কেন?'

'তাহলে? আলাদা আলাদা?'

'অবশ্যই!'

'সারাদিন একসাথে থাকব অথচ রাতে আলাদা, কেমন দেখায় না?'

'যেমন খুশি দেখাক!' ঝাঁঝিয়ে উঠল রূপা। 'তা নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি।'

পাশাপাশি দু'রুম নিল ওরা। শরীরের ধুলো তাড়াতে আধঘণ্টা ধরে গোসল করে নতুন এক সেট শার্ট-প্যান্ট গায়ে চড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। নিজেকে অনেক হালকা, পরিচ্ছন্ন লাগল। রূপার তৈরি হতে আরও পনেরো মিনিট বেশি লাগল। সন্ধে প্রায় হয়ে এসেছে তখন। হোটেলেই ডিনার সেরে নিল ওরা, তারপর বেরিয়ে পড়ল রাতের কিমশাকা সিটি দেখতে।

একটা কাজও অবশ্য আছে; একজনকে খুঁজে বের করতে হবে; একটা চিঠি পৌঁছে দিতে হবে তাকে। লোকটা এদেশের নামকরা এক মুসলমান ব্যবসায়ী। তার ছেলে পাঠিয়েছে চিঠিটা। কিমশাকা ইউনিভার্সিটির মেধাবী ছাত্র ছিল সে, রাজনীতি করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় কয়েক মাস আগে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যায় সে গুপ্ত পুলিসের হাত থেকে। অন্য অনেকের মত কিমশাকায় সারাজীবনের জন্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তাকে। এই খবরটা জানা ছিল না রানা বা রূপার। শহরের ব্যস্ততম বাণিজ্যিক এলাকায় বেশ বড় এক ইলেকট্রনিক্সের দোকান আছে তার। মালিকের নাম ইরতিজা খালিদ। মানুষটা ছোটখাট, পঞ্চাশের মত বয়স। থুতনিতে মেহেদী রাঙানো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মাথায় টুপি। বিশেষ কারণ নেই, তবু সরাসরি চিঠিটা দিল না রানা।

কিছুক্ষণ দোকানের পণ্য সম্ভার দেখল ওরা ঘুরেফিরে। বিদেশী খদ্দের ভেবে লোকটা নিজেই দেখাল এটা-সেটা, গুণগান বর্ণনা করল। ওরই এক ফাঁকে চিঠিটা তার হাতে গুঁজে দিল রানা। আরও খানিক ঘোরাঘুরি করল ওরা, তারপর বেরিয়ে এল। ততক্ষণে ওদের ধন্যবাদ জানাতে জানাতে মুখ ব্যথা হয়ে গেছে ইরতিজা খালিদের।

বেশ রাত করে হোটেলে ফিরল রানা-রূপা। ভোরে আশপাশের ওয়াইল্ডলাইফ দেখতে যাওয়ার সমস্ত আয়োজন পাকা করে ঘুমাতে গেল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে খেয়াল নেই, দরজায় আচমকা দমাদম শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রানার। ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। এত জোরে ধাক্কা মারা হচ্ছে, মনে হলো এখনই ভেঙে পড়বে দরজা।

'হু ইজ ইট!' ক্রুদ্ধ হাঁক ছাড়ল ও।

'পুলিস! ওপেন দ্য ডোর!'

'পুলিস!' বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল রানা. সঙ্গে সঙ্গে দমকা বাতাসের মত একদল পুলিস ঢুকে পড়ল। সবার হাতে উদ্যত রাইফেল। অবাক হওয়ারও সময় পেল না ও। এক অফিসার এগিয়ে এল গটমট করে। ওর দু'হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

'মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ!' বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়ছে ওর

'ট্যুরিস্ট হিসেবে এসেছেন কিমশাকায়?'

'হ্যাঁ!'

'আপনাকে গ্রেফতার করা হলো গোয়েন্দাবৃত্তির অভিযোগে।'

'কি বলছেন আপনি!' থতমত খেয়ে গেল রানা।

'আপনার বান্ধবীকেও একই অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে.' ক্রূর হাসি ফুটল লোকটার মুখে।

'আপনাদের মারাত্মক কোন ভুল হয়েছে, অফিসার,' মরিয়া হয়ে বলল ও। 'আমরা আজই···' করিডর থেকে 'ঠাস্' করে চড়ের সাথে রূপার তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে আসতে থেমে গেল। 'কি হচ্ছে এসব! মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলার মত···' দ্রুত সেদিকে এগোতে গেল ও, কিন্তু পারল না। পথরোধ করে দাঁড়াল দুই পুলিস। ভাব দেখে মনে হলো আর এক পা এগোলে মেরেই বসবে।

হা-হা করে হেসে উঠল লোকটা। 'কাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হয়, আমরা খুব ভাল জানি তা। বিশেষ করে তারা স্পাই হলে তো কথাই নেই। তাদের জন্যে সব সময়ই বিশেষ ধরনের আয়োজন করে থাকি আমরা। দেখবেন···'

'কেন বারবার একই কথা বলছেন!' রেগে উঠল রানা। 'আমরা ট্যুরিস্ট। আমরা এসেছি···'

'এক রাষ্ট্রদ্রোহীর ষড়যন্ত্রমূলক চিঠি তার বাবার হাতে তুলে দেয়ার জন্যে,' মাঢ়ি বের করে হাসল লোকটা। 'তাই তো?'

থমকে গেল ও। ভয়ের শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে, ঘাড়ের সমস্ত খাটো চুল সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল। 'ষড়যন্ত্রমূলক চিঠি?'

'ইরতিজা খালিদকে আজ সন্ধ্যায় তার ছেলের একটা চিঠি দেননি আপনি আর আপনার বান্ধবী?'

'হ্যাঁ, দিয়েছি,' অস্বীকার করে লাভ নেই জেনে বলল ও। 'কিন্তু তাতে ষড়যন্ত্রমূলক কিছু ছিল না।'

'কি ছিল তাহলে, বলুন দেখি,' মিটিমিটি হাসতে লাগল অফিসার। যেন ভারী মজা পাচ্ছে রানার ছেলেমানুষী দেখে

'টাকার জরুরী দরকার ছিল ছেলের. টেলিফোনে বাবার সাথে কথা বলার অনেক চেষ্টা করেও লাইন পায়নি খবরটা তাই চিঠিতে জানিয়েছে। ছেলের নাম এহ্তেশাম। তাকে জীবনে কখনও দেখিনি আমি। চিঠি নিয়ে কাসেমপা বর্ডারে অপেক্ষা করছিল ও কাউকে দিয়ে হাতে হাতে বাবার কাছে পৌঁছানোর জন্যে। আমি কিমশাকা সিটিতে আসছি জেনে কাজটা করে দিতে অনুরোধ করেছে এহ্তেশাম। আমি মানবিক কারণে ওটা পৌঁছে দিয়েছি। এরমধ্যে কোথায় অন্যায়, কোথায় ষড়যন্ত্র, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

গা জ্বালানো ভঙ্গিতে মাথা ওপর-নিচ করতে লাগল লোকটা। 'তা বটে। এক রাষ্ট্রদ্রোহীর চিঠি আদান-প্রদানের মধ্যে কোন অন্যায় আপনার চোখে না পড়ারই

কথা। কিন্তু আমি দুঃখিত যে আপনাদেরকে গ্রেফতার করতেই হচ্ছে আমার বড় ভয়ঙ্কর অভিযোগ, মিস্টার। এক দেশদ্রোহীকে সাহায্য করা। এই অপরাধের একমাত্র শাস্তি কি জানেন তো?'

'চিঠিতে টাকার প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। আমি জানি।'

চেহারা কঠিন হয়ে উঠল অফিসারের। 'আপনি পড়েছেন ওটা?'

'আমি নই। আমাকে নিশ্চিন্ত করার জন্যে এহ্‌তেশাম নিজেই পড়ে শুনিয়েছে। ওটায় টাকার প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন বিষয় ছিলই না।'

'মিথ্যে কথা! ছিল।'

'ছিল না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। হঠাৎ কি খেয়াল হতে প্রশ্ন করল, 'ইরতিজা খালিদ কোথায়?'

'তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।'

তিক্ত হাসি ফুটল ওর মুখে। 'এবার মনে হয় বুঝতে পারছি এ নাটকের অর্থ কি।'

ভুরু নাচাল লোকটা। 'কি?'

'ইরতিজাকে বন্দী করা। লোকটা একে মুসলমান, তার ওপর এদেশের নামকরা ধনীদের একজন। লোকটার আরও একটা পরিচয় আছে, মুসলমানদের মধ্যে সে যথেষ্ট জনপ্রিয়। যদ্দূর মনে হয় আপনাদের প্রেসিডেন্ট তাকে আর সহ্য করতে পারছে না। তাকে পারছে না ভাল কথা, কিন্তু আমাদের মত নিরীহ বিদেশীদের নিয়ে টানাটানি কেন?'

'সে সব জায়গামত গেলেই জানতে পারবেন। চলুন।'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার!' খেঁকিয়ে উঠল অফিসার। 'পুলিস স্টেশনে

'তার আগে একটা ফোন করতে চাই আমি,' বলল রানা।

আবার মাড়ি বের করে হাসল লোকটা। 'লইয়ারকে? বিলিভ মি, ভয় পেয়ে গেছি। সত্যি!'

'আমি এখানকার ব্রিটিশ কনসালের সাথে কথা বলতে চাই,' কঠিন গলায় বলল ও। 'এদেশে আমাদের স্বার্থ ব্রিটেন...'

'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এত রাতে তার ঘুম ভাঙিয়ে লাভ হবে না। সে আসবে না।'

'কেন?'

'এদেশে রাতের বেলা বিদেশী দূতাবাসের কারও বের হওয়া নিষেধ। কথা সকালে বলবেন। এখন চলুন।'

অসহায় বোধ করল রানা। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। করিডরে হুটোপুটির আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাতে রূপাকে দেখতে পেল অবিন্যস্ত চুল, চোখ লাল ফরসা গালে চার আঙুলের দাগ ফুটে আছে। দুই পুলিস দু'দিক থেকে শক্ত করে ধরে রেখেছে ওকে। ওর অসহায় অবস্থা দেখে মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল রানার, কিন্তু কিছু করার নেই দেখে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল। ও

নিজেই এখন অসহায়। বোকার মত কিছু করে বসলে পরে পস্তাতে হবে।

অফিসার ও তার সঙ্গীদের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল রানা–মোট সাতজন। নাহ্, কিচ্ছু করার উপায় নেই। অফিসার বাদে অন্য সবার হাতে এসকেএস রাইফেল, ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে ধরা। একদল ক্ষুধার্ত হায়েনা যেন। চোখ দিয়ে নির্লজ্জের মত চাটছে, রূপাকে। যে দুই পুলিস ওকে ধরে রেখেছে, স্পর্শ-সুখের আশায় তারা ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারা দেখেই ওর মনের অবস্থা বুঝে ফেলল রানা।

ঘৃণায় রি রি করছে রূপা। কিন্তু কিছু বলতে পারছে না নীরবে যতদূর সম্ভব সরে-সামলে থাকার চেষ্টা করছে।

'চলুন, কোথায় যেতে হবে,' বলে দ্রুত রূপার দিকে এগোল রানা। জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে লোক দুটোকে সরিয়ে দিয়ে নিজে ওকে ধরল 'মন শক্ত রাখো,' বলল নিচু গলায়। 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে কেঁদে ফেলল রূপা। 'ওরা…ওরা আমাকে…আমাকে…'

'শাট আপ!' কষে দাবড়ি লাগাল অফিসার। 'কিছু বলার থাকলে ইংরেজিতে বলুন, নইলে চুপ করে থাকুন। চলুন, বেরোন!'

প্রায় খেদিয়ে এনে লিফটে তোলা হলো ওদের। দু'জনের ব্যাগেজও নিয়ে এসেছে দুই পুলিস। ফয়েইয়ে রানা-রূপাকে দেখেই চোখ ঘুরিয়ে নিল ডেস্ক ক্লার্ক। ব্যস্ত হয়ে পড়ল জরুরী কাজে। হোটেলের আরও কিছু কর্মচারী ছিল আশপাশে, প্রত্যেকে এমন ভাব করল যেন কিছুই চোখে পড়ছে না তাদের।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এল দলটা। সামনেই একটা পুলিস-ভ্যান ও জীপ গাড়ি দেখতে পেল রানা। ওখানে জটলা করছে আরও চার-পাঁচজন পুলিস। দলটাকে দেখতে পেয়ে তৎপর হয়ে উঠল তারা। জীপের পিছনে তোলা হলো ওদের দু'জনকে সাথে উঠল দুই পুলিস, অফিসার সামনে। এক মিনিটের মধ্যে হোটেল কম্পাউন্ড ছেড়ে প্রায় জনশূন্য রাস্তায় এসে উঠল গাড়ি দুটো, ছুটল পুবদিকে।

পথের দু'দিকের লাইটপোস্টে ছাড়া-ছাড়া বাতি জ্বলছে। একটায় আছে তো পরের দু'তিনটেয় নেই। দু'দিকের বাড়িঘর, দোকানপাট সব অন্ধকার। ঘুমিয়ে পড়েছে কিমশাকা সিটি। পাঁচ মিনিটের যাত্রাপথে দুটো নেড়ি কুকুর ছাড়া অন্য কোন প্রাণী চোখে পড়ল না রানার।

একটা নিচু, একতলা ভবনের সামনে থেমে দাঁড়াল জীপ ওটার কপালে একটা সাইনবোর্ডে সোয়াহিলি ভাষায় কি সব লেখা। অর্থ না বুঝলেও লেখার ওপরের প্রতীকটা ঠিকই চিনল রানা। ওটা পুলিসের প্রতীক অফিসারের পীক্‌ড্ ক্যাপে আছে ওই প্রতীক।

ভেতরে নিয়ে আসা হলো ওদের। দুটো খটখটে চেয়ারে বসতে দেয়া হলো এক বয়স্ক, টেকো অফিসারকে কিছু নির্দেশ দিল প্রথম অফিসার সাথে সাথে ব্যস্ত হয়ে উঠল লোকটা, মোটা একটা খাতা খুলে রানা-রূপার বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রথম অফিসারের বয়ান অনুযায়ী একটানা দশ মিনিট

খস্‌খস্‌ করে লিখে গেল লোকটা। সবশেষে তার সই নিয়ে সশব্দে বন্ধ করল খাতা।

পুরোটা সময় চুপ করে বসে থাকল রানা। মাথার মধ্যে এলোমেলো চিন্তার ঝড়। কি করবে দিশে করে উঠতে পারছে না। একা হলে এত ভাবত না, রূপার জন্যে ভাবতে হচ্ছে ওকে। বোঝা যাচ্ছে এরা একজনকে ফাঁসাতে গিয়ে প্রয়োজনে আরও দশজনকে ফাঁসাতেও ভালই অভ্যস্ত। এদের কাছে ন্যায়-অন্যায় কিছু না। সুবিচার আশা করা বৃথা।

ভালই মুসিবতে পড়া গেছে, ত্যক্ত-বিরক্ত মনে ভাবল রানা। এখন এই বিপদ থেকে···প্রথম অফিসারের গলা কানে আসতে ধ্যান ভাঙল ওর।

'উঠে পড়ুন!' বলল সে।

'কোথায়..?'

হাত তুলে ওর পিছনের একটা ফাঁকা সেল দেখাল অফিসার। 'আপাতত ওখানে। রাত বেশি নেই, ঘুমিয়ে নিন। কাল এমন চান্স পাবেন কিনা কে জানে!' শেষ বাক্যটা নিচু গলায় বলল। পরে যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, এমনভাবে বলল, 'আপনাদের মালপত্র আমাদের জিম্মায় থাকবে।'

'আমি ব্রিটিশ···'

'মনে আছে, মনে আছে!' বিরক্ত হয়ে বলল লোকটা। 'সকালে তার সাথে কথা বলার সুযোগ পাবেন আপনি। এখন উঠুন।'

সেলে ভরে দেয়া হলো ওদের। দশ বাই দশ হবে ওটা। নোংরা। দুর্গন্ধে উপায় থাকলে ভূতও পালাবে। রুমের দু'দিকে দুটো কট। জাজিম আছে বটে, কিন্তু ভেতরে তুলো আছে কি না সন্দেহ। শুধু নারকেলের ছোবড়া, খড়মড় করে। এই পরিবেশ-পরিস্থিতিতে ঘুমানোর প্রশ্নই আসে না, কাজেই দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে কটে বসে থাকল রানা। রূপা বসল ওর গা ঘেঁষে।

নিজের চিন্তায় ডুবে ছিল বলে বেশ খানিক পর ব্যাপারটা খেয়াল করল রানা—রূপা কাঁপছে। কারণ জানতে চাইল না ও, কোনরকম সান্ত্বনার বাণীও শোনাবার চেষ্টা করল না। এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকল মূর্তির মত।

কখন যেন চোখ লেগে এসেছিল ওর, হঠাৎ মৃদু হাসির আওয়াজে তন্দ্রা ছুটে গেল। ঘুরে অফিসের দিকে তাকাল রানা, দেখল কার সাথে যেন টেলিফোনে কথা বলছে প্রথম অফিসার। কান খাড়া করল ও। সোয়াহিলি ভাষা মোটামুটি বোঝে, তাই লোকটার কথা বুঝতে সমস্যা হলো না। কিন্তু যা শুনল, তাতে গায়ের সমস্ত রোম দাঁড়িয়ে গেল, বুক কেঁপে গেল ভয়ে। রূপাকে নিয়েই আলোচনা করছে হারামজাদা।

সকাল আটটায় এক আর্মি ক্যাপ্টেন এসে ঢুকল স্টেশনে। তাকে দেখামাত্র বুক ধড়ফড় করে উঠল রানার, বুঝতে পেরেছে কেন এসেছে লোকটা। রাতে যে অফিসার ওদের অ্যারেস্ট করেছে, তার সাথে আলাপ জুড়ে দিল লোকটা। প্রথম দর্শনেই ক্যাপ্টেনকে সুবিধের মনে হলো না ওদের। দু'জনের কথাবার্তা, হাসি,

আর ঘনঘন ওদের সেলের দিকে তাকানো দেখে আশঙ্কায় ভেতরটা কুঁকড়ে গেল রানার। একটু পর রূপার ট্রাভেল ব্যাগ বাইরে নিয়ে গেল এক সেপাই, তাই দেখে ধড়ফড়ানি বাড়ল আরও। রূপাও খেয়াল করল ব্যাপারটা, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর।

'শোনো, রূপা,' দ্রুত বলে উঠল রানা। 'মনে হচ্ছে ওরা আমাদের আলাদা করে ফেলতে যাচ্ছে। যদি তাই হয়, তাহলে যে করে হোক আমি পালাব। তুমি ভয় পেয়ো না। মন শক্ত রেখো। খুব শীঘ্রি তোমাকে মুক্ত করে আনব আমি।' বলল বটে, কিন্তু কণ্ঠে যথেষ্ট দৃঢ়তা ফুটল না। রূপাও তা টের পেল

'কি করে?'

মাথা নাড়ল ও। 'জানি না। এখনও কিছু ঠিক করিনি।'

'আশ্চর্য! এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না আমি ব্যাপারটা। মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কোন দুঃস্বপ্ন দেখছি।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' বলল রানা। 'ঘাবড়িয়ো না। অতীতে এরচেয়েও অনেক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি আমরা। সাহস রাখো, নইলে মন দুর্বল হয়ে পড়বে।'

রূপা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কয়েকজোড়া ভারী বুটজুতোর আওয়াজ কানে আসতে আর বলা হলো না। আর্মি অফিসারকে নিয়ে এদিকেই আসছে পুলিস অফিসার। সাথে আর্মির চার জোয়ান। সশস্ত্র। সেলের গরাদ খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল পুলিস অফিসার। রূপার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। 'আপনি বাইরে আসুন, মিস্!'

'কেন?' রানা প্রশ্ন করল।

ওর প্রশ্নের ধরন দেখে চেহারা বিগড়ে গেল আর্মি অফিসারের। 'তোমাকে তার কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?'

পাশ থেকে তার কাঁধে হাত রাখল পুলিস অফিসার, তাকে সরিয়ে দিয়ে এক পা এগোল। 'ওঁকে মেয়েদের কারাগারে রাখার হুকুম এসেছে,' বলল সে। 'প্রেসিডেন্টের হুকুম।'

হারামীর বাচ্চা মিথ্যে কথাটাও ঠিকমত বলতে শেখেনি, ভাবল রানা। রূপাও বুঝে ফেলল ব্যাপারটা।

'আপনাদের কেসটা প্রেসিডেন্ট নিজে ডীল করছেন,' আবার বলল সে। 'কই, মিস্, আসুন!'

'তার আগে ব্রিটিশ কনসালের সাথে দেখা করতে চাই আমরা,' রানা বলল দৃঢ় গলায়। 'যতক্ষণ সেটা না হচ্ছে, ততক্ষণ কোথাও যাচ্ছে না ও।'

'শা-লা, "—"!' সোয়াহিলিতে জঘন্য এক গাল দিল আর্মি অফিসার। জোয়ানদের উদ্দেশে বলল, 'চুলের মুঠি ধরে বের করে নিয়ে এসো মেয়েটাকে।'

এবারও পুলিস অফিসার বাধা দিল। প্রবেশ পথ আগলে রানাকে বলল, 'পরিস্থিতি জটিল করে তুলছেন আপনি। আমি ব্রিটিশ কনসালকে খবর দিয়েছি, যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বেন তিনি। সরকারী কাজে বাধা দেবেন না, যেতে দিন

ওঁকে। নইলে…' পিছনে একজোড়া পায়ের শব্দে থেমে ঘুরে তাকাল, 'ওই তো, মিস্টার রবার্টসন এসে গেছেন!'

লোকটা দীর্ঘদেহী ষাট-পঁয়ষট্টির মত বয়স। চেহারাই বলে দেয় বহু পোড় খাওয়া মানুষ। ঝানু কূটনীতিক। 'গুড মর্নিং!' বলে একে একে প্রত্যেকের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি। অভিজ্ঞ চোখ পরিস্থিতি আঁচ করে নিল মুহূর্তে। 'মিস্টার মাঙ্গো, এঁদের দু'জনের কথাই বলেছিলেন আপনি? বাংলাদেশী ট্যুরিস্ট?'

'হ্যাঁ। বসুন, প্লীজ,' পুলিস অফিসার বলল। রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। 'বাইরে আসুন। কি নালিশ জানাবেন জানান। মিস্, আপনিও আসুন।'

আধঘণ্টা পর।

স্টেশন-ইন-চার্জের রুমে রবার্টসনের মুখোমুখি বসে আছে রানা ও রূপা। রানার যা বলার ছিল, বলা শেষ। আলোচনার শুরুতেই নিজেদের সত্যিকারের পরিচয় লোকটাকে জানিয়েছে ও, এ দেশে আসার উদ্দেশ্যও। এ মুহূর্তে পরিস্থিতি নিয়ে নীরবে মাথা ঘামাচ্ছেন কূটনীতিক। তাঁর চেহারায় আশার কোন আলো দেখতে পাচ্ছে না ওরা।

অনেকক্ষণ পর মুখ খুললেন তিনি। 'ব্যাপারটাকে আপনাদের দুর্ভাগ্য বলব, না এদেশের প্রেসিডেন্টের, বুঝে উঠতে পারছি না।'

'অর্থাৎ?' রানা বলল।

'এই দেশটা সংস্কারের দিকে যতটা না ডার্ক, প্রেসিডেন্ট লগুম্বা তার চেয়ে হাজার গুণ ডার্ক, মিস্টার রানা একটা দেশের প্রেসিডেন্ট যে এত অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হতে পারে, কল্পনাই করা যায় না। লগুম্বার কাছে হিন্দু, মুসলিম, ক্রিশ্চিয়ান কোন ধর্মের কোন মূল্য নেই সে চলে তার আদিম কুসংস্কারবাদী গ্রাম্য পুরোহিতদের নির্দেশে। তাদের কথামত নির্বিচারে গণহত্যা, নারী…' থেমে গেলেন কূটনীতিক। 'কিন্তু সেসব থাক। এখন প্রথম কাজ হচ্ছে, ওরা যদি মিস রূপাকে নিয়ে যেতে চায়, তাহলে বাধা না দেয়া।'

'কি বলছেন!' দ্রুত রূপাকে দেখে নিল ও।

'ঠিকই বলছি,' মাথা দোলালেন রবার্টসন 'বাধা দিয়ে লাভ হবে না, বরং তাতে সমস্যা আরও জটিল হবে। এবং আপনাকে বুদ্ধি পরামর্শ দেয়ার আর কোন সুযোগ আমি পাব না।'

'কি পরামর্শ?'

হাসি ফুটল কূটনীতিকের মুখে। 'কমান্ডো হামলা চালিয়ে লগুম্বাকে ঝাড়ে-বংশে উৎখাত করার ' রানার চেহারায় বিস্ময় ফুটতে দেখে হাসিটা আরও চওড়া হলো তাঁর। 'লন্ডনের নির্দেশে গত কিছুদিন থেকে এ জন্যে গ্রাউন্ড ওঅর্ক করছি আমি। এসব ক্ষেত্রে আপনার যে রেপিউটেশন, তাতে আমি শিওর, খুব সহজেই সফল হবেন আপনি তাহলে মিস্ রূপাও মুক্ত হবেন, এ দেশের মানুষও হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

'আপনার বান্ধবীকে ওরা কোথায় নিয়ে যেতে চায়, কেন, আমি জানি। এবং

আগামী পূর্ণিমা পর্যন্ত যে মিস্ রূপা নিরাপদে থাকবেন, সে ব্যাপারেও আমি নিশ্চিত। শুধু নিরাপদেই নয়, রীতিমত রানীর হালে থাকবেন।'

'পূর্ণিমা...' শুরু করেও থেমে যেতে হলো রানাকে।

'ওরা আসছে!' বাইরে কয়েক জোড়া পায়ের আওয়াজ উঠতে চাপা স্বরে বললেন রবার্টসন। 'ওদের মতের বিরুদ্ধে যাবেন না, প্লীজ!'

দরজায় নকের শব্দে ঘুরে তাকালেন ব্রিটিশ হাই কমিশনার 'আসুন, মিস্টার মাঙ্গো!'

কিন্তু মাঙ্গো নয়, দরজা খুলল আর্মির ক্যাপ্টেন লোকটা। 'কথা শেষ হলো আপনাদের?' বিরক্ত চেহারায় বলল লোকটা।

'সরি, অফিসার!' রবার্টসন বললেন। 'হয়েছে। মিস্ রূপাকে নিয়ে যেতে পারেন আপনি।'

কোন কথা না বলে উঠে পড়ল রূপা। রানাও উঠল। 'যাও,' নরম গলায় বলল ও। 'সময়মত তোমার স্বপ্নের রাজকুমার আসবে তোমাকে পঙ্খীরাজে করে উড়িয়ে নিয়ে যেতে।'

এরমধ্যেও ও রসিকতা করছে দেখে কিছুক্ষণ চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকল রূপা। তারপর হাসল। কি ভেবে কান-গাল লাল হয়ে উঠল ওর মুখ নামিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমি তার অপেক্ষায় থাকব।'

কূটনীতিক উঠে এলেন। একটা সস্নেহ হাত রাখলেন ওর কাঁধে। 'ইয়াং লেডি,' বললেন মৃদু কণ্ঠে। 'ওদের কোন নির্দেশ অমান্য করবেন না দয়া করে। যখন যা নির্দেশ আসবে, মেনে চলবেন। তাহলে কোন ক্ষতি হবে না আপনার। আই অ্যাশিওর ইউ!'

রানার দিকে তাকাল রূপা, তারপর ওঁর দিকে ফিরে মৃদু মাথা দোলাল। 'বেশ।'

'গড ব্লেস ইউ, মাই চাইল্ড।'

দুই

কিমশাকা প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ-সংলগ্ন কোর্টইয়ার্ড থেকে ভেসে আসা বিরতিহীন গুলির শব্দে বিদীর্ণ হচ্ছে ভোরের নীরবতা। একাধিক রাইফেল গর্জে চলেছে অনবরত। এরই মধ্যে রক্তে ভিজে উঠেছে ইয়ার্ডের এক অংশের মাটি।

দুঃখজনক, ভাবছে কিমশাকার আজীবন প্রেসিডেন্ট, হ্যারল্ড লুই লগুম্বা। কিন্তু কিছু করার নেই। তার বিরোধিতা যে করবে, তাকে চূড়ান্ত শাস্তি পেতেই হবে। এ তার দেবতাদের 'বিধান', তাদের ইচ্ছে অগ্রাহ্য করার তো কোন উপায় নেই। অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে সে অসহায়। ছোটবেলা থেকেই গ্রাম্য পুরোহিতের পরামর্শ অনুযায়ী চলে আসছে সে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চলবেও। এ ব্যাপারে

কখনোই আপস করবে না লগুম্বা। তাহলে দেবতাদের 'অসন্তুষ্ট' করা হবে।

প্রকাণ্ডদেহী মানুষ হ্যারল্ড লগুম্বা। প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, বুকের ছাতি চুয়াল্লিশ ইঞ্চি। ষাঁড়ের মত মোটা গর্দান। হাতদুটো দেহের তুলনায় দীর্ঘ, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। চোখ ছোট, কুতকুতে, নাকের খুব কাছে বসানো। পুরু ঠোঁট, থ্যাবড়া নাক। দু'কান প্রায় সেঁটে আছে খুলির সাথে। মুখটা চৌকো। মাথা ন্যাড়া। কয়েকদিন পর পর কামায় সে। সব মিলিয়ে দেখতে বিকট লাগে। বয়স চল্লিশ।

ভীষণ গোঁড়া পরিবারে জন্মের পরই মায়ের ইচ্ছেয় গ্রাম্য পুরোহিত নানা ধরনের আচার উপচারের মাধ্যমে দেবতাদের হাতে 'অর্পণ' করে লগুম্বাকে অনেকে বলে তারা নাকি 'ডার্ক গড'। কেউ বলে 'ইভেল গড'। গড তো গডই, তা আবার ডার্ক হয় কি করে? ইভেলই বা হয় কি করে? যত্তসব ফালতু কথা। তারা অবশ্যই পবিত্র।

আসলে তাদের শেখানো পথ অনুসরণ করে লগুম্বা যে অবিশ্বাস্য 'আধ্যাত্মিক' ক্ষমতা অর্জন করেছে, প্রতিপক্ষের তা সহ্য হয় না। তাই এসব ফালতু কথা বলে বেড়ায়। অনেক দেখেছে সে। পবিত্র দেবতারা রুষ্ট হয়ে একবার যার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, জুজু ভর করে তার ওপর। নির্মম, শোচনীয় পরিণতি ঘটে তার। লগুম্বা জানে তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে, নিজের মধ্যে তাদের প্রভাব স্পষ্ট টেরও পায়।

দেবতারা যে তার ভেতরেই বাস করে, সেটা ও বোঝে। তারা জীবন্ত, বাস্তব! দেবতারাই ক্ষমতায় বসিয়েছে লগুম্বাকে। কে তার শত্রু, কে তার মিত্র, সেটাও তারাই বলে দেয়। তাদেরকে সমীহ করে সে, ভয় করে। তাই কখনও তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করার কথা চিন্তাও করতে পারে না। দেবতাদের নির্দেশ পেলেই মানুষের ওপর নির্যাতন করে সে, প্রয়োজনে হত্যাও করে।

কাজটা শেষ হলে শান্তি পায় লগুম্বা। খুব ভাল লাগে, নিজেকে পবিত্র লাগে। এতেই বোঝা যায় দেবতারা তাকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে। তার মানে লোকে তাঁদের সম্পর্কে যা বলে, মিথ্যে বলে। তাকে হিংসে করে বলে এসব বলে বেড়ায়।

গুলির শব্দ থেমে গেল, হঠাৎ করে নেমে এল নীরবতা সামান্য বিরতি, তারপর শোনা গেল একাধিক বোল্ট টানার আওয়াজ। লগুম্বা জানে আজকের মত কাজ শেষ হয়েছে ফায়ারিং স্কোয়াডের। বাকি কাজ সারবে তাদের অফিসাররা। একটু পরই শুরু হলো তা। গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়া 'অভিশপ্তদের' মাথার পিছনে পিস্তলের একটা করে বুলেট ঢুকিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করছে স্কোয়াডের নিয়ম অনুযায়ী।

হাতে ধরা একটা তালিকা দেখল প্রেসিডেন্ট লগুম্বা। একচল্লিশজন পুরুষ ও মহিলাকে দেবতাদের ইচ্ছেয় বলি দেয়া হয়েছে আজ, ওটা তাদের নামের তালিকা। তার দেবতাদের বিরোধিতা করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল ওরা। শেষ গুলির আওয়াজ মিলিয়ে যেতে রোজকার মত, আজও সন্তুষ্টির একটা উষ্ণ ধারা অনুভব করল সে শিরায় শিরায়।

জানালার কাছ থেকে পিছিয়ে এসে নিজের প্রকাণ্ড ডেস্কের পিছনে বসল। তার তিনশো পাউন্ড ওজনের দেহের ভারে ককিয়ে উঠল চেয়ার। পশ্চিমা দেশগুলো তো বটেই, এমনকি তার প্রতিবেশীরাও তাকে উন্মাদ বলে সম্বোধন করে। তবু সে একটা দেশের মাথা। ক্ষমতায় টিকে থাকতে তাকে বহু কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়াসহ গত ছয় বছরে কমবেশি দেড় লাখ দেশবাসীকে খতম করতে হয়েছে। আরও প্রায় লাখখানেক বন্দী আছে তার 'রিএডুকেশন ক্যাম্পে'। তাদের ব্যবস্থাও হবে।

ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক মানুষ সে। ধূর্ত, কৌশলী এবং নির্দয়। ছয় বছর আগে আর্মিতে কর্নেল ছিল, নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে ভাগিয়ে ক্ষমতা দখল করে খুব দ্রুত জেনারেল হয়েছে। এখন সে কিমশাকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী–প্রেসিডেন্ট জেনারেল (অব.) হ্যারল্ড লুই লগুম্বা।

নিজের ট্রাইব ছাড়া আর কোন জাতি-গোত্রকে ছয় বছরের মধ্যে একদিনের জন্যেও শান্তিতে থাকতে দেয়নি সে। তার মধ্যে আফ্রিকানরা ছাড়াও আছে খ্রিস্টান মিশনারী ও চ্যারিটি কর্মী। 'দেশের' সবচেয়ে অর্থ ও সম্পদশালী মুসলমান ও বহু পুরুষ ধরে অভিবাসী ভারতীয় হিন্দু ব্যবসায়ীরাও আছে। কাউকেই এক ইঞ্চি ছাড় দেয়নি লগুম্বা।

এদের যাকে খুশি তাকে ধরে প্রথমে পাঠিয়েছে 'রিএডুকেশন' সেন্টারে। সেখান থেকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। ধরা পড়ার পর কেউ তার মুঠো থেকে ছাড়া পেয়েছে, এমন রেকর্ড একেবারেই নেই।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লগুম্বা। এত মানুষ হত্যা করেও তৃপ্ত নয় সে। সৈন্যদের দিয়ে গুলি না করিয়ে তাদের যদি সে নিজ হাতে অ্যাসেগাই দিয়ে একেক জনকে খুঁচিয়ে মারতে পারত! তার চোখে সাদারা বেশি বিপজ্জনক। কারণ ওরা শিক্ষিত। এই ধরনের মানুষকে সে একদম বিশ্বাস করে না। বিশেষ করে মিশনারী ও চ্যারিটি ওয়ার্কারদের। গোঁড়া, অশিক্ষিতদের লিখতে পড়তে শিখিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করে তারা, নিজেদের অভাব-অনটন ইত্যাদির ব্যাপারে সচেতন আর অসন্তুষ্ট করে তোলে। রাজনীতিতে নাক গলাতে উৎসাহ জোগায়

এরপর তারা সামনে নিয়ে আসে ফ্যাকাসে, ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে, নিজেদের দেবতাদের ছেড়ে তাকে বিধাতা হিসেবে মেনে নিতে আহ্বান জানায়। মিশনারীদের এইসব নোংরা কার্যকলাপের জন্যেই লগুম্বার দেশের ছাত্ররা আজ লেখাপড়া ছেড়ে উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। এই জন্যেই তাকে দেশের শীর্ষ বিদ্যাপীঠ, কিমশাকা ইউনিভার্সিটি বন্ধ করে দিতে হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্যে। তার শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল ছাত্ররা।

এখন অবশ্য ঠাণ্ডা মেরে গেছে। সমস্ত পশ্চিমা মিশনারী ও চ্যারিটি ওয়ার্কারদের ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে সে দেশ থেকে। এদিকে দেশের প্রতি তিনজন কলেজ গ্রাজুয়েটের মধ্যে দুজনই উধাও হয়ে যাওয়ায় অন্যরা এখন আতঙ্কিত ঘর থেকে বের হওয়াই ছেড়ে দিয়েছে। এরপর ছিল কিছু এশিয়ান ও আরব মুসলমান আর ভারতীয় হিন্দু ব্যবসায়ী। নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে এদেশে

এসে বংশ পরম্পরায় ব্যবসার নামে লুটপাট চালাচ্ছিল ওরা। তাদেরকে দেশছাড়া করেনি সে, ক্ষমা করে দিয়েছে, প্রতি মাসে মোটা অঙ্কের চাঁদা দেবে—এই অঙ্গীকারের বিনিময়ে।

দেশ ছেড়ে যে পালিয়ে যাবে, তাদের সে পথও নেই। আটকে দিয়েছে লগুম্বা। পাসপোর্ট আটকে দিয়েছে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ওপরও আরোপ করেছে বিধিনিষেধ। নির্দিষ্ট অঙ্কের ওপরে টাকা তুলতে পারবে না কেউ তুলতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, অনেক কৈফিয়ত দিতে হবে। তারপরও যদি লগুম্বা সন্তুষ্ট না হয়, কাজ হবে না।

এ নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক কথা উঠেছে, জাতিসংঘ প্রতিবাদ লিপিও পাঠিয়েছে। পাত্তা দেয়নি প্রেসিডেন্ট, 'দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার' বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, পশ্চিমাদের সমস্ত কার্যক্রম একটা মাত্রা পর্যন্ত সীমিত থাকবে। থেকেছেও তাই

নাস্তা খাওয়ার সময় হয়েছে দেখে উঠে পড়ল লগুম্বা; অন্দরমহলের দিকে এগোল। অনুগত কুকুরের মত পিছন পিছন চলছে তার পি.এস নিজের গোত্রের মানুষ। তার আশপাশে যারা আছে, তারা প্রত্যেকেই তাই। নিজ গোত্রের ছাড়া অন্য কাউকেই বিশ্বাস করে না সে। ধারে ঘেঁষতে দেয় না। তার গার্ড রেজিমেন্ট, সিমবা (সিংহ)-র প্রতিটা সদস্যও একই গোত্রের।

একেবারে আধুনিক, পাশ্চাত্য সমরবিদ্যা তারা অর্জন করেছে প্রথমে রাশিয়ান, পরে আমেরিকানদের কাছে। সাজানো টেবিলে বসল লগুম্বা। আপনমনে হাসছে। অতীতের কথা ভেবে। ক্ষমতায় বসেই মস্কোর সাথে 'বন্ধুত্ব' স্থাপনের ইচ্ছের কথা জানিয়েছিল সে কিমশাকার রুশ রাষ্ট্রদূতকে কয়েকদিনের মধ্যে ওদের বিশেষজ্ঞরা এসে হাজির তার সেনাবাহিনীকে আধুনিক শিক্ষা দিতে। তা তো দিয়েছেই, সঙ্গে প্রচুর ফাও অস্ত্রশস্ত্র। যদিও ভারী কিছু নয়। তারপরও যা দিয়েছে, অনেক।

যখন লগুম্বা বুঝল তাকে আর কিছু দেয়ার নেই মস্কোর, রুশদেরই কাছে প্রশিক্ষিত নিজের সিক্রেট পুলিস বাহিনীকে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। মাসখানেকের মধ্যে পালিয়ে বাঁচল শেষ রুশটাও। এরপর আমেরিকানদের 'বন্ধু' হতে চাইল সে, এল ওরা। নিজেদের যুদ্ধকৌশল শেখাল, ফাও দিল। কাজ শেষ হয়ে যেতে তাদের সাথেও একই আচরণ করল লগুম্বা। খেদিয়ে দিল।

রাজধানীতে খুঁজলে দু'চারজন রুশ বা আমেরিকান এখনও পাওয়া যাবে, তারা দূতাবাসের কর্মচারী। খুবই সীমিত তাদের সংখ্যা। তবে ইদানীং নতুন করে রাশিয়ার সাথে গাঁট বাঁধার বিষয় নিয়ে গুরুত্বের সাথে ভাবছে সে কারণ দুনিয়া এখন দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। কোন এক বৃহৎ শক্তির পক্ষ না নিলে টিকে থাকা কঠিন। নির্বান্ধব, সহায়হীন হয়ে যাবে তুমি।

মানুষটা যেমন, খায়ও তেমনি। আধ ঘণ্টা ধরে চারজনের সমান নাস্তা খেল সে। তারপর দু'কাপ কড়া মিষ্টি দেয়া কালো কফি। কফি তার দেশে হয় না। অথচ তাকে কিনেও খেতে হয় না। মার্কিন দূতাবাসের তরফ থেকে প্রতি মাসে

'বন্ধুত্বের নিদর্শন' হিসেবে পাঠানো হয় তার জন্যে।

খাওয়া সেরে অফিসে ফিরে এল প্রেসিডেন্ট সিগারেট ধরিয়ে তৃপ্তির সাথে টানতে লাগল। ক্ষমতা নিরাপদ করার জন্যে এ পর্যন্ত যা যা করেছে সে, ভালই করেছে। যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার ছাপ আছে সবকিছুর মধ্যে। দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের কোন অভাব নেই, সুইস ব্যাঙ্কে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে টাকারও অভাব নেই।

জৈবিক খিদে তার যাকে বলে আগ্রাসী. কিছুতেই মিটতে চায় না। এই বয়সেই বারোটা বিয়ে করে ফেলেছে। তাদের চারজন ইওরোপীয়, একজন আরব, দু'জন ভারতীয়, এবং বাকি সবাই নিজ গোত্রের। প্রত্যেকে তারা সুন্দরী। অনেকের বয়স এখন পর্যন্ত বিশও পেরোয়নি। অবশ্য এদেশীরা ছাড়া অন্যরা স্বেচ্ছায় বিয়ে করেনি তাকে, করেছে দায়ে পড়ে। না করে উপায় ছিল না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এক নারী বেশিদিন রোচে না তার। তাই আবার বিয়ের শখ জেগেছে। কনে খুঁজছে লগুম্বা. উপযুক্ত সুন্দরী আর কুমারী মেয়ে পেলেই···

তবে এতেও সন্তুষ্ট নয় হ্যারল্ড লগুম্বা, নিত্য নতুন মেয়ে চাই তার। কথাটা সবার জানা। তাই তার পা-চাটার দল প্রায়ই তার জন্যে দেশী-বিদেশী সুন্দরীদের জোগাড় করে আনে। চুটিয়ে মজা লোটে সে। তবু মন ভরে না, তাই দু'মাস আগে নতুন এক ডিক্রী জারি করেছে সে 'দেবতাদের নির্দেশে'। তার অনুমতি ছাড়া দেশের অন্যান্য উপজাতি এবং হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান মেয়েদের বিয়ে দেয়া যাবে না।

বিয়ে দিতে হলে মেয়েকে লগুম্বার দেবতার 'আশীর্বাদ' নিতে হবে। তার সাথে এক রাত কাটালেই তা অর্জন করতে পারবে কনে অবশ্য পালনীয় আইন। ফলে কিছুটা সমস্যা অবশ্য দেখা দিয়েছিল, তার ওপর খেপে গিয়েছিল হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টানরা ছেলেমেয়ের বিয়েশাদী বন্ধই করে দিয়েছিল।

অবস্থা বেগতিক দেখে পরে কিছুটা ছাড় দিতে বাধ্য হয়েছে লগুম্বা, ডিক্রীর সংশোধনী আনতে হয়েছে তাকে। তাতে বলা হয়েছে: যে মেয়ের অভিভাবক একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দিতে পারবে, সে মেয়ের 'আশীর্বাদের' প্রয়োজন নেই। গুমোট ভাবটা কেটে গেছে এর ফলে, অথচ লগুম্বার কোন লোকসান হয়নি কারণ টাকার যে অঙ্ক, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের তা দেয়ার ক্ষমতা নেই।

শেষ হয়ে আসা সিগারেট ফেলে আরেকটা ধরাতে যাচ্ছিল প্রেসিডেন্ট, এই সময় মৃদু নক্ করে ভেতরে ঢুকল তার একান্ত ব্যক্তিগত সচিব। 'স্যার, ব্রিটিশ কনসাল জেনারেল আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী,' বলল সে বিনয়ের সাথে। 'ক্যাপ্টেন মোকানাও আছেন তাঁর সাথে।'

'কি চায় ইংরেজের বাচ্চা?' ভুরু কুঁচকে তাকাল সে।

'বলছেন, গোপনীয় বিষয় আপনাকেই শুধু বলবেন।'

'হুঁম! যাও, নিয়ে এসো।'

এক ঘণ্টা ধরে বক্ বক্ করে মুখ ব্যথা হয়ে গেল ব্রিটিশ কনসাল জেনারেল হ্যারল্ড রবার্টসনের, তবু মানুষটা টলে না। স্ফিংক্সের মত থম মেরে বসে আছে তো আছেই, নড়ছে না তাঁর কথা মন দিয়ে শুনেছে কি না, সে-কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে

উঠলেন বৃদ্ধ। ফের যদি নতুন করে সব বলতে হয়, তাহলে···পাশে দাঁড়ানো ক্যাপ্টেন মোকানার দিকে তাকালেন তিনি অসহায় ভঙ্গিতে।

প্রেসিডেন্টকে আড়াল করে শ্রাগ করল লোকটা। এই ক্যাপ্টেনই গতকাল পুলিস স্টেশন থেকে রূপাকে নিয়ে এসেছে। মাঙ্গোর বন্ধু। প্রমোশন আর প্রেসিডেন্টের সুনজরের আশায় রূপাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছে মাঙ্গো। মাঝরাতে ফোনে খবরটা জানিয়ে দিয়েছে মোকানাকে।

'মেয়েটা সুন্দরী?' অবশেষে মুখ খুলল প্রেসিডেন্ট লগুম্বা।

'শুধু সুন্দরী বললে অন্যায় হবে, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, স্যার!' আশান্বিত হয়ে উঠলেন কূটনীতিক। 'অপূর্ব সুন্দরী। এত সুন্দরী মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। তার ওপর কুমারী সে।'

'যে মেয়ে বয়ফ্রেন্ডের সাথে বিদেশ ট্যুর করতে বেরিয়েছে, সে কুমারী?' কুৎসিত চেহারা আরও কুৎসিত করে তুলল প্রেসিডেন্ট।

'ওরা বাঙালী, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। বাংলাদেশী। ওদের মধ্যে বিয়ের আগে দৈহিক সম্পর্ক নিষেধ। প্যালেস হোটেলে পাশাপাশি দুই রুমে ছিল ওরা। নইলে তো এক রুমেই···'

'দেখা যাবে কেমন কুমারী!'

'নিশ্চই, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' রবার্টসন বললেন। 'আমি ওর বয়ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলেছি এ ব্যাপারে। কারণ আমি জানি মেয়ে কুমারী না হলে আপনার পূর্ণিমা রাতের আচার পূর্ণ হবে না। তাছাড়া বিয়ের জন্যে এরকমই একটি মেয়ে খুঁজছেন আপনি। ছেলেটা শপথ করে বলেছে ওই মেয়ে কুমারী।'

চকিতে মানুষটাকে দেখে নিল প্রেসিডেন্ট।

'শুনেছি ছেলেটা মায়ের একমাত্র সন্তান। মা হার্টের রোগী। ছেলের কিছু হলে···ছেলেটা যে ভাবেই হোক আপনার মনের লালিত ইচ্ছে পূরণ করেছে। অন্তত সে কথা ভেবে হলেও ক্ষমা করে দিন ওকে। আমি বর্ডারে পৌঁছে দেব ওকে।'

'আপনি তাকে নিজ দায়িত্বে বর্ডার পার করে দিয়ে আসবেন কথা দিচ্ছেন?'

'অবশ্যই, ইওর এক্সেলেন্সি! শুধু নিজ দায়িত্বেই নয়, আমি নিজে গিয়ে পার করে দিয়ে আসব।'

'বেশ,' বলে ক্যাপ্টেন মোকানার দিকে ফিরল লগুম্বা। 'ফোনে মাঙ্গোর সাথে কথা বলো। ছেড়ে দিতে বলো বদমাশটাকে।'

এক ঘণ্টা পরের কথা।

কটে পা ঝুলিয়ে বসে আছে রূপা লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। ঘুমের অভাবে ঝিম-ঝিম একটা ভাব আবিষ্ট করে রেখেছে ওকে, মাথায় এলোমেলো চিন্তার জট। ঘুমে আপনাআপনি বুজে আসছে চোখ, কিন্তু জোর করে খুলে রেখেছে ও সাহস পাচ্ছে না।

কিমশাকা সেন্ট্রাল জেলের মেয়ে বন্দীদের এক সেলে আছে ও এ মুহূর্তে রাজবন্দীদের 'এ' ক্লাস সেল। বারো বাই ষোলো সাইজের। একটা কট, একটা

টেবিল ও দুটো চেয়ার, ফার্নিচার বলতে এই পর্যন্তই। ওর ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখা। ওটার গা ঘেঁষে অ্যাটাচড্ বাথরুমের দরজা। ভেতরটা ভালই; পরিচ্ছন্ন। কটে বিছানো চাদর, বালিশের কভার, সবই সদ্য পাট ভাঙা। বাথরুম থেকে ফিনাইলের গন্ধও আসছে।

এত খাতির যত্ন ভাল লাগছে না রূপার। স্পাইঙের অভিযোগে আটক কাউকে এত যত্নে রাখা হয়, কখনও শোনেনি ও। মেয়ে বলেই এত খাতির করা হচ্ছে ওকে? কিন্তু তাই বা কেন হবে? রবার্টসনের কথা খেয়াল হলো। তার কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে ভেতরে বিশেষ কোন ইঙ্গিত আছে। আগামী পূর্ণিমা পর্যন্ত ও নিরাপদে থাকবে, রানীর হালে থাকবে, কেন বলেছিল লোকটা? কিসের নিরাপত্তার কথা বোঝাতে চেয়েছে?

মনের মধ্যে বারবার একটা বিশ্রী সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে, কিন্তু মেনে নিতে পারছে না ও। বিদায়ের সময়ে রানার রসিকতার কথা মনে পড়তে হাসি ফুটল মুখে। বুকের বল বেড়ে গেল। ওর ওপর পূর্ণ আস্থা আছে রূপার অন্তর থেকে জানে, কাউকে কথা দিলে রানা তা রাখে। তাতে যত বাধাই আসুক না কেন। সম্পূর্ণ অন্য ধাতের মানুষ এই মাসুদ রানা। ও আসবেই। পূর্ণিমা কবে যেন?

বাইরে ভারী পায়ের আওয়াজ উঠতে সচকিত হলো রূপা–এদিকেই আসছে। খানিক পর একটা বাঁক ঘুরতে দেখা গেল লোকগুলোকে। তিনজন। সেই আর্মির ক্যাপ্টেন ও দুই জোয়ান। দরজা খুলে ভেতরে চলে এল অফিসার, জোয়ান দু'জন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল।

'চলুন,' কোনরকম ভূমিকার ধার ধারল না মাকোনা।

'কোথায়?' রূপা বলল।

'প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে। প্রেসিডেন্ট দেখা করতে চান আপনার সাথে।'

ভেতরে ভেতরে ঘাবড়ে গেলেও প্রকাশ করল না ও। 'কেন?'

নোংরা হাসি ফুটল লোকটার মুখে। 'সেটা তাঁকেই জিজ্ঞেস করবেন ঘুরে পিছনে তাকাল। 'অ্যাই! ব্যাগটা নাও একজন,' ইঙ্গিতে রূপার ব্যাগ দেখাল সে। 'আপনার ভাগ্য ভাল, আর সেলে থাকতে হবে না। এখন থেকে প্যালেসে থাকবেন।'

কথা বাড়াল না রূপা। রবার্টসনের ভবিষ্যদ্বাণী এরই মধ্যে ফলতে শুরু করেছে দেখে বিস্মিত। 'আমার সঙ্গী, সে কোথায়?'

'হারারের পথে। ছেড়ে দেয়া হয়েছে তাকে।'

আনন্দে বুক নেচে উঠল রূপার। কিন্তু এবারও ভেতরের উচ্ছ্বাস চেপে রাখল। দশ মিনিট পর প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের পোর্চে থামল ক্যাপ্টেনের জীপ। ওখান থেকে রূপাকে সোজা অন্দর মহলে নিয়ে এল মোকানা। বিশালদেহী দুই মহিলার হাতে তুলে দিল। খাণ্ডারনী চেহারার দুই আফ্রিকান ভূত 'নাও,' বলল মোকানা। 'সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রেসিডেন্টের সামনে হাজির করো একে।'

একই দিন দুপুরের মধ্যে ঢাকায় পৌঁছে গেল দুঃসংবাদটা। বিসিআই প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের নিয়মতান্ত্রিক প্রাত্যহিক কাজে ছন্দপতন ঘটল।

কিমশাকার ব্রিটিশ কনসাল জেনারেল রবার্টসনের সাথে দীর্ঘ সময় কথা বললেন তিনি। ভদ্রলোক প্রেসিডেন্ট হ্যারল্ড লুঁই লগুম্বার কীর্তিকলাপ সম্পর্কে যেটুকু আভাস দিলেন, তাতে রীতিমত হার্ট অ্যাটাক হওয়ার দশা হলো তাঁর।

সন্ধের পর একটা ফোন এল, মাসুদ রানা করেছে হারারে থেকে। অনেকক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলে গেল রানা। ওর বলা শেষ হতে মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'অবশ্যই! শুরু করে দাও!'

পরদিন রবার্টসনের মাধ্যমে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাল বাংলাদেশ। মিথ্যে অভিযোগে আটকে রাখা বাংলাদেশী নাগরিক মিস্ রূপাকে ছেড়ে দেয়ার জোর দাবি জানাল কিমশাকার কাছে। তিন দিন পর তার জবাব এল সেটা এরকম: এই নামে কোন বাংলাদেশী নাগরিক সে দেশে নেই।

লোকটাকে দেখামাত্র কলজে শুকিয়ে খট্‌খটে হয়ে উঠল রূপার। নাড়ির গতি বেড়ে গেল দ্বিগুণ। ধড়ফড় করছে বুক।

খালি গায়ে স্ফিংক্সের মত বসে আছে প্রকাণ্ডদেহী মানুষটা, কিমশাকার আজীবন প্রেসিডেন্ট, জেনারেল হ্যারল্ড লগুম্বা। পরনে সাদা শর্টস। পায়ে কেডস্। হাতে টেনিস র‍্যাকেট। ওটার কিনারা দিয়ে বাঁ হাতের পাথরের মত শক্ত তালুতে থেকে থেকে আঘাত করছে। এখন তার প্র্যাকটিসের সময়। তার আগে একবার বিদেশী সুন্দরীটিকে দেখার লোভ কিছুতেই সংবরণ করা সম্ভব হলো না তার পক্ষে, তাই ডাক পড়েছে রূপার।

এই ডাকের অপেক্ষায় সকাল থেকেই ওকে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে দুই ভয়াল দর্শন মহিলা। এটাই ওদের কাজ। ধরে আনা মেয়েদের লগুম্বার পছন্দ অনুযায়ী সাজিয়ে তার সামনে হাজির করা। নাভির নিচে তেকোনা একখণ্ড কাপড় আর ঊর্ধ্বাঙ্গে বুক ঢাকার জন্যে আরেকটা টুকরো, লগুম্বার মতে এই হচ্ছে নারীর শ্রেষ্ঠ পোশাক। বাড়তি পোশাক পরে প্রকৃতির দেয়া সৌন্দর্যকে আড়াল করে রাখার কোন অধিকার তাদের নেই। যাদের জন্যে ওরা জন্মেছে, তাদেরকে নিজেদের যাবতীয় সম্পদ দেখাতে হবে

লোকটার লোমহীন, ব্যারেলের মত পেশীবহুল বুক দেখে ঘৃণায় রি-রি করে উঠল রূপার সারাদেহ। তবু নিজেকে সামলে রাখল ও। প্রায় উলঙ্গ নিজেকে লোকটার চোখে কেমন লাগছে, অনুমান করতে কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু তা নিয়েও মাথা ঘামাল না। স্রেফ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল। ওর দেহটাই কেবল রয়েছে শয়তানটার লোভী চাউনির সামনে, মনটা নেই। আর কোথাও রয়েছে সেটা। ও যেন ও নয়, দম দেয়া একটা পুতুল মাত্র। নজর অন্যদিকে।

র‍্যাকেটের ঠাস্-ঠাস্ আওয়াজ থেমে গেল। ওটা চেয়ারের পাশে রেখে উঠে দাঁড়াল লগুম্বা। ঠিক দাঁড়াল না, গ্যাস ভরা প্রকাণ্ড এক বেলুন বাঁধনমুক্ত হয়ে ভেসে উঠল যেন। প্রায় নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এল রূপার দিকে। আড়ষ্ট হয়ে উঠল ও ভয়ে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যেতে চাইল।

'বাই গড! রবার্টসন একদম খাঁটি কথাই বলেছে দেখছি।'

চোখের সামনে মানুষটার সমতল, ব্লু-ব্ল্যাক পেট দেখতে পেয়ে পাথর হয়ে গেল রূপা, মনটাকে আরও দূরে ভাগিয়ে দিল।

'এদিকে তাকাও,' গমগমে কণ্ঠে বলল লগুম্বা। 'আমার চোখের দিকে।' তাই করল রূপা।

টায়ারের মত পুরু দু'ঠোঁট প্রসারিত হলো প্রেসিডেন্টের। দু'চোখে ঝিলিক মেরে উঠল উদগ্র কামনা। হাত বাড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে কি ভেবে থেমে গেল। 'ভয় করছে?'

সাহস করে ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল ও।

'গুড! এই তো চাই,' দাঁত বেরিয়ে পড়ল আজীবন প্রেসিডেন্টের। 'শুনেছি, তুমি কুমারী, কথাটা সত্যি?'

রূপা নিরুত্তর।

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'আমি যদি তোমাকে আমার মেয়েমানুষ বানাতে চাই, তুমি আপত্তি করবে?' প্রশ্নটা করে নিজেই তাজ্জব হয়ে গেল লগুম্বা। এরকম প্রশ্ন জীবনে কখনও করেনি সে, এই প্রথম। এসব ব্যাপারে মেয়েদের মতামত থাকতে পারে, কোনদিন ভাবেনি। যাকে খুশি ধরে এনে খায়েশ মিটিয়েছে। কিন্তু আজ…

'না।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল দানব। রূপার প্রায় অনাচ্ছাদিত, উঁচু বুকের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল। 'আর ক'দিন পর পূর্ণিমা। ওইদিন রাতে তুমি আমার মেয়েমানুষ হবে।'

সুবোধ বালিকার মত মাথা কাত করল রূপা। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল লগুম্বা। বেখেয়ালে হাত বাড়িয়েছিল ওকে ধরার জন্যে, আবারও সামলে নিল।

'না, আজ নয়। পূর্ণিমার রাতে দেবতাদের আশীর্বাদ নিয়েই…'

লোকটার বাকি কথা কানে গেল না রূপার মনে মনে বলল, এই পূর্ণিমা হয় তোর জীবনের শেষ পূর্ণিমা হবে, নয়তো আমার।'

তিন

একটু বিরতি দিল মাসুদ রানা। পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরে তেত্রিশ জোড়া চোখ অপলক তাকিয়ে আছে ওর দিকে, একচুল নড়ছে না কেউ। মন্ত্রমুগ্ধ যেন।

হারারের বাইরের এক ফার্ম হাউসে বিশেষ এক বৈঠকে মিলিত হয়েছে দলটা। রানাসহ পাঁচজন বাংলাদেশী, অন্যদের মধ্যে একজন জার্মান, দু'জন জিম্বাবুইয়ান, সামরিক বাহিনীর অফিসার, বাকি সবাই ব্রিটিশ। এদের একজন স্থানীয় ব্রিটিশ হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি, বাকি সবাই সে দেশের সামরিক

বাহিনীর। কমান্ডো। একজন মেডিক ও একজন পাইলটও আছে অবশ্য এদের মধ্যে।

ত্রিশ সেকেন্ডের মত বিরতি দিয়ে আবার শুরু করল রানা। 'গত ছয় বছরে লগুম্বার উফা সিমবার হাতে প্রায় লাখ খানেক কিমশাকান মারা গেছে। তাদের অর্ধেকেরও বেশি ছিল স্রেফ নিরীহ নাগরিক। ধর্মের নামে, দেবতাদের নামে তাদেরকে "বলি" দেয়া হয়েছে। ওদেশে নারীর কোন মর্যাদা নেই। দেশী-বিদেশী যে-ই হোক, উফা সিমবা অথবা প্রেসিডেন্টের পা-চাটাদের কারও চোখে লাগলেই তাকে ধরে নিয়ে হাজির করা হয় লগুম্বার ভোগের জন্যে।

'বিশেষ করে হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চিয়ান–এদের ওপরই লগুম্বার বেশি আক্রোশ। কিমশাকায় তার লোভের হাত থেকে বেঁচে আছে, এমন একটা মেয়েও সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রতি মাসে ধর্মের নামে গণধর্ষণ আর গণহত্যা চালায় লোকটা। পূর্ণিমার রাতে···

এক সময় দীর্ঘ বক্তব্য শেষ হলো আরেকবার ভাল করে সবার প্রতিক্রিয়া খেয়াল করল ও। নেই। অন্তত প্রত্যেকের চেহারা তাই বলছে। কারও তরফ থেকে কোন আপত্তি ওঠে কি না দেখতে চাইছিল রানা, উঠল না। অবশ্য ওঠার কথাও নয়। বাঙালী যে ক'জন আছে, সবাই বিসিআইয়ের–সুমন্ত, আসলাম, শোভন ইউসুফ। শোভন এদেশেই ছিল, অন্য তিনজন এসেছে আশপাশের কয়েকটা দেশ থেকে

ব্রিটিশ কমান্ডো গ্রুপ এসেছে সে দেশের ইচ্ছায়। লগুম্বাকে উৎখাতের জন্যে অনেকদিন আগেই গ্রাউন্ড ওয়ার্ক সেরে রেখেছে ব্রিটেন। কিন্তু আসল কাজ করতে পারেনি বিভিন্ন সমস্যার কারণে। রানাকে কিমশাকায় উদ্ধার করতে গিয়ে যখন ওর সত্যিকারের পরিচয় জানলেন, সুযোগটা চিনতে ভুল হয়নি হ্যারল্ড রবার্টসনের হাজার হোক জাত বেনিয়া। মাসুদ রানার নেতৃত্বে এই সুযোগে কাজ উদ্ধার করা সহজ হবে বুঝতে পেরে উঠেপড়ে লাগেন তিনি। তার ফল হিসেবে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে হারারেতে এসে পৌঁছায় এরা।

আরেকজন যে আছে, সে জার্মান–হ্যান্স ল্যাংসডর্ফ। রানা এজেন্সির বার্লিন চীফ প্রায় সাত ফুট লম্বা সে, পাশেও দশাসই। এক কথায় স্রেফ একটা দানব বয়স পঁয়ত্রিশের মত। অতীতে জার্মান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিল ফলশ্রিময়েগার প্যারাশুটিস্ট। মুখটা প্রায় গোল, প্রকাণ্ড। সারামুখ কাটাকুটির দাগে ভর্তি। আর্কটিকে এক অভিযানের সময় তাদের বিরুদ্ধে রুশদের হয়ে স্যাবোটাজ ঘটাতে গিয়ে ধরা পড়া এক পুব জার্মান অফিসারকে খালি হাতে পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগে চাকরি যায় ল্যাংসডর্ফের।

পুরানো বন্ধুত্বের সূত্রে তখনই লোকটাকে এজেন্সিতে যোগ দেয়ার অনুরোধ জানায় রানা। সেই থেকে চার বছর এই পদে আছে সে। ভয়ঙ্কর মানুষ পারে না, এমন কাজ ত্রিভুবনে নেই।

আপত্তি তো নয়ই, কোন প্রশ্নও উঠল না সন্তুষ্ট হলো রানা। মুখোমুখি বসা জিম্বাবুইয়ান আর্মি অফিসারদের একজনের উদ্দেশে বলল, 'মেজর ফরবস্, প্লীজ!'

প্রায় সাথে সাথে একটা গুঞ্জন উঠল ঘরের মধ্যে, প্রজেক্টরের আওয়াজ। এক দেয়ালে বড় একটা ছবি ফুটে উঠল। এক প্রাসাদের। 'এটা কিমশাকার প্রেসিডেন্ট হাউসের ছবি,' রানা বলল। 'ব্রিটিশ স্যাটেলাইট থেকে তোলা। এই হচ্ছে প্রাসাদের সামনের লন, যেখানে প্রতি পূর্ণিমার রাতে উৎসবের নামে নোংরামির আসর বসে।'

প্রথম ছবি মুছে আরেকটা ছবি দেখা দিল, তারপর আরেকটা, তারপর আরও একটা। একের পর এক ছবি বদল হচ্ছে আর রানা সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছে এক সময় সে পর্বও শেষ হলো। এবার উপসংহারের পালা।

রানার বক্তব্য শেষ হতে প্রথম প্রশ্ন করল ল্যাংসডর্ফ। 'কবে হামলা চালাচ্ছি আমরা?'

'চারদিন পর। পূর্ণিমার রাতে,' রানা বলল। ব্রিটেন শুধু লোক দিয়েই নয়, এ দেশের ওপর প্রভাব খাটিয়ে অন্যভাবেও সাহায্য করছে রানাকে। ওদের জন্যে ট্র্যান্সপোর্ট, অস্ত্রশস্ত্র, ট্রেনিং ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছে তারা ব্রিটেনের অনুরোধে মেজর ফররস্ রয়েছে সে সব দেখাশোনার দায়িত্বে।

'কাজ সেরে রিট্রিট করব কিভাবে?' এবার প্রশ্ন করল ইউসুফ। সে-ও বিশালদেহী মানুষ, প্রায় ছয় ফুট লম্বা। আর্মিতে সুবেদার মেজর ছিল। অবসর নিয়ে বিসিআইয়ে যোগ দিয়েছে সুমন্ত তার ছোট ভাই।

'প্রাসাদের পিছনে মোটর পুলের গ্যারেজ,' বলল রানা। এ- তথ্য হ্যারল্ড রবিনসনের সরবরাহ করা। 'লগুম্বার নিরাপত্তার জন্যে গ্যারেজে সব সময় দুটো আমেরিকান হাফ-ট্রাক, একটা ব্রিটিশ সালাদিন আর্মার্ড কার, এবং একটা ওপেন-বেড ট্রাক মজুত থাকে। ওগুলো নিয়ে সরে পড়ব আমরা। কিমশাকা সিটির ত্রিশ মাইল উত্তরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার এক পরিত্যক্ত এয়ারস্ট্রিপ আছে, আমাদের তুলে নিতে সেখানে দুটো কপ্টার থাকবে। কোনমতে ওই পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেই হলো।'

একটু বিরতি দিল ও। 'খুব একটা কঠিন বাধার মুখে পড়তে হবে না আমাদের, আগেই বলেছি। ও দেশের সেনাপ্রধান কর্নেল টোগো উফা সিমবাদের বড় একটা অংশ নিয়ে রাজধানীর বাইরে আছে সো কলড় বিদ্রোহ দমন করতে গেছে। তাই উফা সিমবারা সংখ্যায় অল্প থাকবে।'

'পূর্ণিমার রাতে কি ধরনের উৎসব হয় প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে?' প্রশ্ন করল নিরীহ দর্শন এক ইংরেজ, জর্জ মেডিক সে। শিশুসুলভ চেহারা।

'ডার্ক আফ্রিকান উৎসব,' রানা বলল। গম্ভীর 'প্রত্যেক পূর্ণিমার রাতে গাঁজা, ভাংসহ নানান মাদকের নেশা করে জঘন্য সব কীর্তি করে ওরা এক মাস পর পর এই বিশেষ আয়োজন হয় প্রেসিডেন্টের ইচ্ছায়। সপরিবারে যেতে হয় সবাইকে। ছয় বছর হলো ক্ষমতায় বসেছে লগুম্বা, ছয় বছর ধরেই চলছে এসব। নিজের ডার্ক গডদের, "সন্তুষ্ট" করার জন্যে এ কাজ করে সে কারও প্রতিবাদ করার সাহস নেই। যে করবে, তার মৃত্যু অবধারিত। দেশী বা বিদেশী, যে-ই হোক। সন্ধের পর থেকে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের সামনের বাগানে নাচ গানের আসর শুরু হয়। তার সাথে চলে গাঁজা, আফিম, হেরোইন ও ভাং সেবনের পর্ব সরকারের পয়সায়

রাত বারোটার ঘণ্টা পড়লেই শুরু হয়ে যায় নারকীয় যজ্ঞ, একদম প্রকাশ্যে। যার যে মেয়েকে পছন্দ, তাকে নিয়ে মেতে ওঠে বাবার সামনে মেয়েকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে, ভাইয়ের সামনে বোনকে...'

'কেউ বাধা দেয় না?' প্রশ্ন করল হতভম্ব ব্রিটিশ।

'প্রশ্নই আসে না। কারণ সে সময়ে প্রত্যেকে অন্য জগতে থাকে। হামলে পড়ে অন্য কারও বউ-মেয়ের ওপর।'

'ওখানে না গেলেই তো হয়!'

মাথা নাড়ল রানা 'হয় না। সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তাদের কে কে অনুপস্থিত, উফা সিমবার কড়া নজর থাকে সেদিকে। কেউ না গেলে পরদিন তার এবং তার পরিবারের সদস্যদের ওপর কি অত্যাচার নেমে আসে, তা কল্পনাও করা যায় না।'

'এতসব তথ্য তুমি জানলে কি করে?' ল্যাংসডর্ফ প্রশ্ন করল।

ওখানকার ব্রিটিশ কনসালের প্রসঙ্গ তুলল রানা। কেন সে এসবের সাথে জড়িয়েছে, তাও খুলে বলল। শুনতে শুনতে চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল জার্মান দানবের। 'তুমি বলতে চাইছ, আমাদের এক বোনকে আটক করেছে ওই শুয়োরের বাচ্চা? এই পূর্ণিমায় ওকে...?'

'যদি আমরা সময়মত পৌঁছতে না পারি, হ্যাঁ।' রূপা কিভাবে ওদেশে বন্দী হলো, এবার সে কথা খুলে বলল রানা। তার সাথে রবার্টসনের সহযোগিতার কথাও। তার পরামর্শ অনুযায়ীই যে এই কমান্ডো মিশনের ব্যবস্থা, তাও বলল।

'নিশ্চয়ই প্যারাজাম্প করতে হবে আমাদের?'

'হ্যাঁ সব আয়োজন রেডি।' বেসে

'প্র্যাকটিস কোথায় করব আমরা?' সুমন্ত প্রশ্ন করল

'এখান থেকে কয়েক মাইল দূরের এক সামরিক এয়ার বেইসে।' একটা তালিকা ল্যাংসডর্ফের হাতে তুলে দিল রানা। 'তোমাকে এই মিশনের ডেপুটি লীডার নিয়োগ করেছি আমি। বেইসে পৌঁছেই এই লিস্ট অনুযায়ী মালপত্র সব বুঝে নেবে।'

লাঞ্চের পর ত্রিশজনের কমান্ডো দলটাকে নিয়ে বেইসের উদ্দেশে যাত্রা করল দুটো ট্রাক আর একটা জীপ আধঘণ্টা লাগল পৌঁছতে।

বেইসের এক মাথায় ঘন বন। বনের প্রান্তে লম্বা একটা কাঠের ঘর। বেশ উঁচু। ফ্লোরও কাঠের পঞ্চাশজন মানুষ অনায়াসে থাকতে পারে ওটায়। আপাতত ক'দিন রানা-বাহিনীর ব্যারাক হিসেবে ব্যবহার হবে সবার জন্যে দু'ঘণ্টা বিশ্রাম ঘোষণা করল রানা, তারপর ব্রিটিশ হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি হ্যারি ক্রুজ, মেজর ফরব্স্, ল্যাংসডর্ফ ও ইউসুফকে নিয়ে বসল বিশেষ বৈঠকে।

এক ঘণ্টা পর

'আপনাদের যাবতীয় জিনিসপত্র রেডি, মেজর মাসুদ রানা,' বলল মেজর

ফরবস্। 'সব বুঝে নিন দয়া করে।'

ল্যাংসডর্ফ বুঝে নিল সব। ত্রিশ সেট ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম, ত্রিশ জোড়া আর্মি ইস্যু হেভি বুট, এবং ত্রিশটা জার্মান জি-থ্রী রাইফেলের স্প্যানিশ সংস্করণ। এছাড়া মর্টার, হ্যান্ড গ্রেনেড, একটা ৫৭ মিমি রিকয়েললেস রাইফেল, মেশিনগান, ফ্লেয়ার ইত্যাদিসহ প্রয়োজনীয় সবকিছুই আছে তার মধ্যে। সব বুঝে নিয়ে মেজর ফরবসের সহকারী, এক লেফটেন্যান্টের বাড়িয়ে ধরা ডকুমেন্টে সই করল জার্মান।

নির্দিষ্ট সময়ে ডাক পড়ল কমান্ডো বাহিনীর।

'অ্যাটেনশন!'

রানার গুরুগম্ভীর কমান্ড শুনে সিধে হয়ে গেল দলের ছাব্বিশ জন সদস্য ও আর ল্যাংসডর্ফ এ মুহূর্তে মূল দলের সাথে নেই। মেডিক জর্জ ও পাইলট হ্যারিসনকেও বাদ রাখা হয়েছে, কেননা ওদের কাজ ভিন্ন।

'স্ট্যান্ড অ্যাট ইজ,' নতুন নির্দেশ দিল ও। তারপর আবার অ্যাটেনশন।

পুরো যুদ্ধের সাজে সজ্জিত দলটার দুই সারির মধ্যে দিয়ে এগোল ও। ওর পাশেই রয়েছে জার্মান দানব। একদম পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো। চোখে পলক পড়ছে না কারও। একটা ব্যাপারে এদের মিল আছে–প্রত্যেকেরই আফ্রিকায় কাজ করার এবং দুয়েকবার করে হলেও প্যারাজাম্পের অভিজ্ঞতা আছে। লোক বাছাইয়ের সময় এদিকটায় বিশেষ নজর ছিল রানার।

এক্স সুবেদার মেজর ইউসুফের সামনে থামল রানা, ওর দেখাদেখি ল্যাংসডর্ফও।

'সুবেদার মেজর ইউসুফ হারুন!' বলল ও। 'মে আই প্রেজেন্ট ক্যাপিটান হ্যানস ল্যাংসডর্ফ, মাই সেকেন্ড ইন কমান্ড।'

লাইন ছেড়ে এক পা এগিয়ে এল ইউসুফ, ব্রিটিশ কায়দায় ডান পা তুলে সজোরে মাটিতে ঠুকল হ্যানসের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, 'সুবেদার মেজর ইউসুফ হারুন অ্যাট ইওর সার্ভিস, স্যার!'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল জার্মান। রানা মনে মনে হাসল বর্তমানে সে যে বেসামরিক, কথাটা হয়তো মনেই নেই ইউসুফের। পুরো মিলিটারি-মার্কা ভাবচক্কর। 'এখন থেকে তুমি দলের সিনিয়র ননকম। দলের চেইন অভ কমান্ড রক্ষা করা, সদস্যদের সমস্যা সমাধান করা ইত্যাদির দিকে কড়া নজর রাখতে হবে তোমাকে।'

'স্যার!'

সন্ধের আঁধার ঘনিয়ে আসতে শুরু হলো মহড়া, ল্যাংসডর্ফের নেতৃত্বে। বিশাল জায়গা জুড়ে কিমশাকার প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের রেপ্লিকা তৈরি করা হয়েছে, এক ঘণ্টা পর পর সেটার কাছে কমান্ডো বাহিনীকে ড্রপ্ করতে লাগল পাইলট হ্যারিসন। জিম্বাবুই এয়ার ফোর্সের একটা সি-১১৯ ব্যবহার করা হচ্ছে সে কাজে।

ওটাতে করেই যাবে বাহিনী।

খাওয়ার জন্যে এক ঘণ্টা বিরতি ছাড়া প্রায় সারারাত ধরে চলল মহড়া। জিম্বাবুই আর্মির একটা দল নকল উফা সিমবার অভিনয় করল। প্যারাট্রুপারদের প্রতিহত করার আপ্রাণ চেষ্টা করল তারা, কিন্তু সুবিধে করতে পারল না। আটবারের মধ্যে পাঁচবারই শোচনীয় পরাজয় মেনে নিতে হলো। চাঁদ উদয় হওয়ায় শেষের তিনবার ধরা পড়ে গেল ট্রুপাররা। ফাঁকা গুলি আর ফাঁকা গ্রেনেড বিস্ফোরণের শব্দে রাতভর সরগরম হয়ে থাকল গোটা অঞ্চল।

'মনে হচ্ছে এবারের মিশন জমবে ভাল,' মহড়ার সমাপ্তি ঘোষণা করে রানাকে বলল ল্যাংসডর্ফ। হাসি উপচে পড়ছে তার দলের সাফল্য দেখে।

'আমারও,' রানা বলল। 'কিন্তু ভুলে যেয়ো না, পূর্ণিমার রাতে রেইড করতে যাচ্ছি আমরা। আজকের মত এত অন্ধকার থাকবে না সেদিন আমাদের স্পষ্ট দেখতে পাবে ওরা।'

'চীয়ার আপ, ম্যান!' ওর পিঠে প্রকাণ্ড হাতের এক চাপড় মারল জার্মান। তারপর রানার মনের কথাটাই বলল, 'সেদিন আমরা আফ্রিকান গাঁজা-ভাঙের সুবিধেও পাব। আজ যা পাইনি।'

পরের দিন ব্যয় হলো গ্রাউন্ড এক্সারসাইজে–রান অ্যান্ড ফায়ার। ডাউন। আপ, হিট দ্য গ্রাউন্ড, ডিগ ইন, আপ, রান, এবং রোল সন্ধের পর বসল প্রাসাদের পুরো লে আউট মুখস্থ করার সেশন। দলের কেউই এ কাজে নতুন নয়, কাজেই সবকিছু অল্প সময়েই আয়ত্ত করে নিল সবাই।

শেষের দিন চূড়ান্ত মহড়ার ফলাফল দেখে হাসি দুই কান পর্যন্ত বিস্তৃত হলো ল্যাংসডর্ফের। গান ধরল সে: ওয়ান উইর বেইড ল্যাটার্ন স্টেহেন, লিলি মার্লিন! উই ইনস্ট, লিলি মার্লিন! (কথা দাও যুদ্ধের পর তুমি আমার হবে, লিলি মার্লিন! আমি না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, লিলি মার্লিন!)

গর্বিত ভঙ্গিতে সোজা সামনে তাকিয়ে আছে আজীবন প্রেসিডেন্ট জেনারেল লগুম্বা তার গর্ব, তার অহঙ্কার, প্রিয় রেজিমেন্ট উফা সিম্বার প্যারেড দেখছে। সিম্বা সোয়াহিলি শব্দ, এর অর্থ সিংহ। উফা অর্থ কুয়াশা। বাহিনীর সদস্যদের মানসিকতা বোঝাতে ব্যবহার করা হয় কথাটা ওরা যেভাবে আচমকা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের খতম করে, তার সাথে নামটা মিলেছে ভালই

ওরা সত্যিই সিংহ। এবং লগুম্বা তাদের প্রতিপালক।

তার ব্যাপারে ভেতরের গোপন কথা জানে তার মা ও গ্রামের পুরোহিত। লগুম্বার জন্মের সময়ই বিভিন্ন লক্ষণ দেখে তারা বুঝেছিল একদিন সে হবে দেশের ত্রাণকর্তা মহান জুলু নেতা। প্রকৃতির ইঙ্গিত সত্যি হয়েছে, আজ সে তাই হয়েছে বটে

সমালোচকের চোখ নিয়ে উফা সিম্বাদের প্যারেড দেখছে জেনারেল, পুরু ঠোঁটের কোণে সন্তুষ্টির, তৃপ্তির হাসি। কয়েক বছর আগেও তলপেটের নিচে এক খণ্ড কাপড়, অস্ট্রিচের পালকের টুপি ও অ্যাসেগাই নিয়ে মার্চ করত ওরা। এখন

সে দিন নেই। এখন করে ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম ও ভারী বুট পরে, অটোম্যাটিক কালাশনিকভ হাতে।

রেজিমেন্টের পায়ের তাড়নায় সৃষ্টি হচ্ছে ধুলোর মেঘ. তার পিছন পিছন আসছে বেশ কিছু আর্মার্ড ভেহিকল্। আমেরিকান হাফ-ট্রাক আছে তার মধ্যে. আছে ব্রিটিশ সালাদিন আর্মার্ড কার। কিমশাকার একমাত্র মটরাইজড, ইনফ্যান্ট্রি ফোর্স। পিছনে কয়েকটা রুশ টি-৩৪ ট্যাঙ্কও আছে কিন্তু আরও চাই তার ওসব।

একসময় বাঁক ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেল রেজিমেন্ট। আপনমনে মাথা নাড়ল লগুম্বা। ওরাই হচ্ছে তার ক্ষমতার উৎস একদিন এদের মাধ্যমেই গোটা আফ্রিকা তার হাতের মুঠোয় চলে আসবে আসবেই। কেননা তার দেবতাদের সেরকমই ইচ্ছে। প্রায় রোজ রাতে ঘুমের মধ্যে তার সাথে দেখা করতে আসে তারা, কথা বলে।

গ্রামের পুরোহিতের বিধান মত কিছু গাছের পাতা ও শেকড় বেটে রস করে খেয়ে ঘুমালেই তারা আসে যখন খুশি তাদেরকে ডেকে আনার ক্ষমতা আছে লগুম্বার। দেবতারা স্বপ্নের মধ্যে তাকে বিরোধীদের প্রতি কঠোর ও নিষ্ঠুর হতে বলে, প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় তাদেরকে খতম করতে বলে। দেবতাদের কথা না মেনে পারে না সে।

লগুম্বার জীবনটা এক বীরগাথা। হত্যার অনেক ধরনের কৌশল সে কিশোর বয়সেই আয়ত্ত করে। ওস্তাদ হয়ে ওঠে অ্যাসেগাই চালনায় মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে চিতাবাঘ ও সিংহ শিকার করেছে সে। নিজের ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্যে সে একাই ধাওয়া করে মেরেছে ওগুলোকে। কাজটা করতে গিয়ে নখের আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়েছে, তবু পিছপা হয়নি লগুম্বা দাগগুলো আজও সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি বহন করছে।

তার নিজের ট্রাইব ছিল ছোট, দুর্বল ও অবহেলিত। সে, হ্যারল্ড লুই লগুম্বা, একা তাকে সংগঠিত করেছে, যোদ্ধার ট্রাইবে রূপান্তরিত করেছে। যারা একদিন শেয়াল কুকুরের মত তাদের মেরেছে. পাইকারী হত্যার মাধ্যমে তাদেরকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে সে। এই কাজটা সে করেছে যাকে বলে একেবারে মুক্ত হাতে, উদার মনে। এখন আর ওসব ছোটখাট বিষয় নিয়ে কোনরকম আগ্রহ বোধ করে না লগুম্বা। এখন তার একমাত্র আগ্রহ দেশের সীমানা আরও বাড়ানোর দিকে

এজন্যে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র চাই। তার কিছু জোগাড় করেছে সে, আরও লাগবে। তাই তো দেশের সমস্ত বড় বড় ব্যবসায়ীকে তার ভাণ্ডারে নিয়মিত টাকা দিতে বাধ্য করছে সে। এ ছাড়া আরও অনেকভাবে ফান্ড মোটা করছে। দেশের জন্যে এর দরকার আছে। দরকার আছে তার ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্যেও।

প্যারেডের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল প্রেসিডেন্ট লগুম্বা এসময় নিয়ম অনুযায়ী তার একান্ত অনুগত সেনাপতি, কর্নেল টোগো সবসময় থাকে তার সাথে। কিন্তু আজ সে নেই। দক্ষিণের এক গ্রামে গেছে 'বিদ্রোহ দমন' করতে আজই ফিরবে। কারণ, পূর্ণিমা অনুষ্ঠান ও কিছুতেই মিস্ করবে না গাড়িতে উঠে প্রেসিডেন্ট ভবনের দিকে রওনা হলো সে। আজই সেই রাত!

তলপেটের কাছটায় কেমন এক শিরশিরে অনুভূতি জাগল বিদেশী সুন্দরী মেয়েটার কথা মনে পড়তে। আজ পূর্ণিমা! আজ রাতে তার ভোগের জন্যে অন্তত এক ডজন মেয়ে হাজির থাকবে।

এই ব্যবস্থাও বিশেষ কারণে করে লগুম্বা। করতে হয়। কেননা পুরোহিত বলেছে, যত নারীকে সে গর্ভধারণ করাতে পারবে, আয়ু তত বছর দীর্ঘ হবে তার। এবং কাজটা করতে হবে পূর্ণিমার রাতে। প্রাসাদে আজ তার বিশেষ আয়োজন চলছে। বাংলাদেশী মেয়েটাকে দিয়ে শুরু করবে লগুম্বা। ওকে বিয়ে করবে ঠিক করেছে।

ইচ্ছে করলে আরও আগেই করতে পারত সে, কিন্তু করেনি। রেখে দিয়েছে 'পবিত্র রাতের' জন্যে। আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। রূপার স্নিগ্ধ, কমনীয় চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠতে আবেশে চোখ বুজল। বেচারী জানে না, ধেয়ে আসছে মৃত্যুদূত। এই পৃথিবীতে আজই ওর শেষ রাত।

চার

অবস্থা বুঝে নিয়ে পূর্ণ গতিতে অ্যাডভান্স করার নির্দেশ দিল মাসুদ রানা, সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিল ওর হাফ-ট্রাক। পিছনেই রয়েছে সালাদিন, তারপর ট্রাক এবং সবার পিছনে শেষ হাফ-ট্রাক। মরুভূমিতে ধুলোর ঝড় তুলে টানা এক ঘণ্টা সর্বোচ্চ গতিতে ছুটল বহর। সর্বোচ্চ আসলে কথার কথা, যে গতি আদায় করা গেল ওগুলোর কাছ থেকে, তাকে বড়জোর দ্রুতগতির হামাগুড়ি বলা যেতে পারে।

যে পথ ধরে ছুটছে, সেটাও তেমনি। পথ না বলে ওটাকে গোট ট্রেইল বলাই ভাল। কিন্তু ওদের গন্তব্যের দিকেই গেছে বলে ওটাকে অনুসরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না রানার।

দিনের আলো যখন ফুটল, রাজধানী কিমশাকা থেকে মাত্র আঠারো মাইল দক্ষিণে তখন বহর। রানা ব্যস্ত ওর বিকল্প প্ল্যান নিয়ে। যে এয়ারস্ট্রিপ হয়ে ওদের ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, এখন আর সেদিকে যাওয়ার উপায় নেই। পিক-আপ স্টেশনকে খবরটা জানানো গেলে ভাল হত, অহেতুক সময় নষ্ট না করে সরে পড়তে পারত ওরা।

কিন্তু এখন সে সুযোগও নেই। অবশ্য তাতে কোন সমস্যা হবে না; নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলে ওরা আপনিই সরে পড়বে।

পিছনে তাকাল রানা। ওর ধারণা কর্নেল ওদের পিছু ছাড়েনি, তেড়ে আসছে। কর্নেল টোগোর পাতা অ্যামবুশ ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা ঝড়ের বেগে। এত সহজে রেহাই দেবে না ব্যাটা। অন্তত ল্যাংসডর্ফের পাকড়াও করা রুশ লোকটাকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা সে করবেই। এ লোককে কিছুতেই হাতছাড়া করবে না সে। টোগোর সাথে তার উপস্থিতিই প্রমাণ করছে, সত্যি সত্যি রাশিয়ার সাথে

কিমশাকার কোন গোপন সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ, মেজর ফরবস যে গুজবের কথা বলেছিল, সেটা মোটেও গুজব নয়।

পাশে তাকাল ও। ড্যাশ বোর্ড আঁকড়ে ধরে শক্ত হয়ে বসে আছে রূপা, নজর সামনে স্থির। এখনও ও স্বাভাবিক হতে পারেনি। একটা কথাও বলেনি এ পর্যন্ত। দম দেয়া পুতুলের মত রানার নির্দেশ পালন করে গেছে কেবল। রানার পৌঁছতে আর পাঁচ মিনিট দেরি হলে কী সর্বনাশ ঘটে যেত, ভাবনাটা মাথায় এলে এখনও থেকে থেকে শিউরে উঠছে। রানার সাথে চোখাচোখি হতে কেমন যেন জড়সড় হয়ে উঠল ও, লজ্জায় লাল হয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

কারণটা বুঝতে অসুবিধে হলো না। সম্রাট লগুম্বার বেডরুমে ওকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় দেখে ফেলেছে রানা, তাই চোখাচোখি হলেই আরক্ত হয়ে উঠছে ও বারবার। আড়ষ্ট হয়ে উঠছে। ব্যাপারটার সমাপ্তি টানা দরকার, ভাবল রানা, নইলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে ওকে নিয়ে।

বিসিআইয়ে কঠোর হৃদয়ের নারী বলে আলাদা একটা খ্যাতি আছে রূপার। পুরুষ সহকর্মীদের সাথে সবসময় একটা কোমল, অথচ দৃঢ় ব্যবধান রেখে চলে ও। কাউকে বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ দেয় না, এমনকি যে রানাকে মনে মনে ওর পছন্দ, যাকে পেলে অন্য মেয়েরা ধন্য হয়ে যায়, সেই রানাকেও না। একসাথে দেশে-বিদেশে অনেক অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করেছে ওরা, একসাথে থেকেছে, এমনকি এক ঘরে রাতও কাটিয়েছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। মাঝখানে অদৃশ্য হলেও কঠিন একটা দেয়াল তৈরি করে রেখেছে ও, সেটা কখনোই ভেদ করতে পারেনি রানা।

নিজেকে পোশাক ও চারিত্রিক দৃঢ়তার আবরণে আবৃত করে রাখার চেষ্টা সবসময়ই ছিল ওর মধ্যে। এতদিন তাতে সফলও হয়েছে রূপা। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা আগে ধস্তাধস্তির শেষ পর্যায়ে লগুম্বা যখন তাকে বিবস্ত্র করে ফেলেছিল, ঠিক সেই সময়ই ম্যাচেটির এক কোপে ওর কল্লাটা নামিয়ে দিয়েছে রানা। জার্মান দৈত্যটা এগিয়ে দিয়েছে ওর জিন্স আর টি-শার্ট। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে জামা-কাপড় পরতে হয়েছে ওকে। সেই লজ্জা কিছুতেই কাটাতে পারছে না ও।

বুঝতে সবই পারছে রানা, শুধু পারছে না কি বলে ওকে সহজ করে তোলা যায়। বেশ কয়েকটা উপায় নিয়ে ভাবল ও, অবশেষে কোনটাই পছন্দ না হওয়ায় একে একে সব বাতিল করে দিল। তারচেয়ে বরং অপেক্ষা করা যাক। কে যেন বলেছিল, 'যে কোন ক্ষত শুকোতে সময়ের চেয়ে বড় নিরামক আর হয় না,' কথাটা রূপার বেলায় খাটে কি না দেখা যাক নাহলে অন্য পথ দেখতে হবে।

ওদিকে রানা যেমন রূপার মনের কথা বুঝতে পেরেছে, তেমনি রূপাও পারছে ওর মনের ভাবনা বিশ্লেষণ করতে। ভেতরের আড়ষ্টতা তাই ক্রমে বাড়ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও মুখ খুলল না দেখে মনে মনে কৃতজ্ঞ হলো রূপা। ওকে ওর চিন্তার মাঠে আরও কিছুক্ষণ চরে বেড়ানোর সুযোগ দেয়ার মত বিচক্ষণতা দেখানোর জন্যে রানার প্রতি শ্রদ্ধা আরও কয়েক ডিগ্রী বেড়ে গেল

দর্শন আর মনস্তত্ত্ব দূরে সরিয়ে রেখে আসল কাজে মন দিল রানা। আরও

এগোবার আগে দিক ঠিক করে নিতে হবে এখনই, নইলে বিপথে চলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। অজায়গায় যেতে গিয়ে ফুয়েলে টান পড়তে পারে। হাফ-ট্রাক থামানোর নির্দেশ দিল ও উপযুক্ত জায়গা দেখে। ব্রেক কষল চালক।

ওদের সামনেই একটা খটখটে শুকনো খাদ, কাঠের নড়বড়ে ব্রিজ রয়েছে ওটা পারাপারের জন্যে। পনেরো গজ দীর্ঘ হবে ব্রিজটা, খাদের মেঝে শ'খানেক ফুট নিচে। প্রায় খাড়া পাথুরে ঢাল বেয়ে সরু একটা ট্রেইল নেমে গেছে ব্রিজের দিকে। ওপারে পৌঁছে বিশ্রাম নেবে ঠিক করল রানা। রথ দেখা কলা বেচা দুটোই হবে তাতে। সরকারী বাহিনী যদি তেড়ে আসেই, রয়ে সয়ে গান স্যালিউট জানানো যাবে।

হ্যানস নেমে এল সালাদিন থেকে, খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা লীডারের সাথে যোগ দিল। সামনে এক পলক তাকিয়েই ধরে ফেলল রানার চিন্তার লাইন।

'ব্রিজটা রিস্কি মনে হচ্ছে,' বলল সে। 'গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে কি না দেখে আসা দরকার।'

'ঠিক বলেছ,' মাথা দোলাল রানা 'চলো।'

দশ মিনিটে পরীক্ষা সেরে ফিরে এল ওরা। ওপর থেকে যতটা মনে হয়েছে ততটা দুর্বল নয় ব্রিজ। পার হওয়া যাবে। একটু সময় লাগবে অবশ্য। বেশি চওড়া নয় বলে ধীরেসুস্থে পার করতে হবে গাড়ি। কাজ শুরু করতে নির্দেশ দিল রানা। আধঘণ্টা পর চতুর্থ গাড়িটা ব্রিজ পার হয়ে আসতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সবাই। ওগুলোকে বড় বড় বোল্ডার আর ঝোপের আড়ালে এমনভাবে রাখা হলো, যাতে ওদের পথ ধরে কেউ এলে তার চোখে না পড়ে।

সবাইকে বিশ্রাম নিতে বলে হ্যানসের দিকে ফিরল রানা। 'লোকটার পরিচয় জানতে পেরেছ?'

'না,' বলল জার্মান। 'কাঁধের ব্যাজ দেখে বোঝা যায় মেজর, কিন্তু নাম বলছে না। এখন একবার দেখব নাকি চেষ্টা করে?'

'এখন না। পরে হবে। ধরলে কিভাবে ব্যাটাকে?'

'অ্যামবুশের সময় আমি আর আলি একটা গাছের আড়ালে পজিশন নিতে গিয়ে দেখি ওখানেই বসা লোকটা। আমাদের দেখে পালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি।'

সিগারেট বের করে তাকে দিয়ে নিজেও একটা ধরাল রানা। 'আমাদের জীবন বীমার পলিসি হতে পারে লোকটা। সামলে রেখো।'

'রাইট, কমান্ডার!'

'তুমি আর আলি পিছনে নজর রাখো। দু'জনকে সামনের দিকে পাঠাও, কোন ল্যান্ডমার্ক পাওয়া যায় কি না খুঁজে দেখে আসুক। মর্টার আর ফিফটি সেভেন এমএমসহ রিয়ার গার্ড বসাও। আর...কোন গাড়িতে সমস্যা-টমস্যা আছে কি না চেক করতে বলো হ্যারিসনকে। মেডিক কোথায়?'

কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনটা দেখাল হ্যানস বুড়ো আঙুল দিয়ে। 'আছে ওদিকে

‘ওকে বলো আহতদের ব্যবস্থা করতে। দ্যাট’স অল।’

সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ডকে বিদেয় করে নিজের হাফ-ট্রাকের দরজা খুলল ও। ভেতরে একা বসে আছে রূপা। জিনস, টী-শার্ট আর কেডসে দারুণ লাগছে ওকে মৃদু হাসল রানা। ‘নামবে?’

তাকিয়ে থাকল রূপা। কিছু বলল না

হাত বাড়াল ও। ‘এসো, খোলা বাতাসে বসি কিছুক্ষণ।’

‘না। আমি ভেতরেই ঠিক আছি।’

চাপাচাপি না করে ওর পাশে বসল রানা। ড্যাশবোর্ডের ওপর রাখা নিজের সারভাইভাল কিট খুলল। ওর মধ্যে ড্রাইড সুপ আছে ইমার্জেন্সি রেশন হিসেবে কিছু হাই পোটেন্সি ভিটামিনও। এছাড়া আছে একটা পিচ্চি ফ্লেয়ার গান, ফ্লেক্সিবল করাত, কিছু ফিশিং লাইন, বড়শিসহ নানান হাবিজাবি ও এই অঞ্চলের একটা ম্যাপ। ওটা বের করে কিট বন্ধ করতে যাচ্ছিল রানা, কি খেয়াল হতে সঙ্গিনীর দিকে ফিরল। এতক্ষণ ওকে দেখছিল রূপা, কিন্তু রানা চোখ তুলতেই ঝট্ করে অন্যদিকে তাকাল।

‘কিছু খাবে?’ বলল ও। ‘ড্রাইড সুপ?’

‘না।’

‘খিদে লাগেনি?’

‘না।’

‘পানি?’

একটু ইতস্তত করে মাথা দোলাল ও। ‘হ্যাঁ, পানি খাব

নিজের ফ্লাস্কটা ওর হাতে তুলে দিল রানা। ‘একটু সুপ খেয়ে নিলে ভাল হত বোধহয়।’

ঢক্ঢক্ করে তিন-চার ঢোক পানি খেয়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছল রূপা। ফ্লাস্ক ফিরিয়ে দিল। ‘খিদে নেই।’ একটুপর আবার বলল, ‘কোনদিকে যাচ্ছি আমরা?’

ওকে বর্তমান নিয়ে ভাবতে দেখে খুশি হয়ে উঠল রানা এটা শুভ লক্ষণ। নিজেকে আস্তে-ধীরে হলেও ফিরে পেতে শুরু করেছে ও, বর্তমান নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে দিয়েছে। ‘এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি।’ ম্যাপটা খুলে নিজের দু’হাঁটুর ওপর বিছাল রানা। ‘দেখি কোনদিকে যাওয়া যায়।’

ওটায় চোখ বুলাতে শুরু করল। কিমশাকা থেকে নিজেদের দূরত্ব ও অ্যাঙ্গেল বের করার চেষ্টা করল প্রথমে। দেখা গেল যে ট্রেইলে রয়েছে ওরা, সেটা মূলত দক্ষিণে গেছে। এ মুহূর্তে যেখানে রয়েছে, সেখান থেকে নির্দিষ্ট এয়ারস্ট্রিপ মাত্র ছয় মাইল পিছনে। কিন্তু ওখানে ফিরে যাওয়া এখন অর্থহীন। এতক্ষণে পিক-আপ টীম নিশ্চয়ই চলে গেছে।

এখন ওদের জন্যে সরে পড়ার সোজা পথ হচ্ছে দক্ষিণে যাওয়া বারোটসিল্যান্ড হয়ে জাম্বিজি নদীর তীরে পৌঁছতে পারলে আর সমস্যা থাকবে না, বতসোয়ানায় পৌঁছে যাওয়া কঠিন হবে না কিন্তু সে-ও অনেক লম্বা পথ। সিকি

দূরত্ব যেতে না যেতে গাড়ির তেল ফুরিয়ে যাবে। তখন হাঁটা ছাড়া উপায় থাকবে না।

ম্যাপের ওপর নজর ঘুরে বেড়াতে লাগল ওর। ধারেকাছে আর কোন বেসামরিক এয়ারস্ট্রিপ আছে কি না, খুঁজতে লাগল। কিন্তু বেশি সময় পেল না, ল্যাংসডর্ফের সতর্কবাণী কানে আসতে ম্যাপ ফেলে এক লাফে নেমে পড়ল ও। একটু দূরে উঁচু এক উই ঢিপির ওপর বিনকিউলার চোখে তুলে দাঁড়িয়ে ছিল দৈত্যাকার জার্মান। ওকে দেখতে পেয়ে অনির্দিষ্ট ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। 'ওরা আসছে!'

'কতদূরে?'

'দশ মিনিটের পথ।'

সুমন্ত ও শোভন ফিরে এল একই সময়। সামনে রাস্তার অবস্থা কি, দেখতে গিয়েছিল ওরা। 'কেমন দেখলে?' হ্যানস প্রশ্ন করল।

শোভন মাথা নাড়ল। 'সুবিধের নয়। কয়েকশো মিটার গিয়ে শেষ হয়ে গেছে ট্রেইল, তারপর ধু-ধু প্রান্তর। ছোট পাহাড়, টিলা আর ঝোপঝাড় ছাড়া কিছু নেই।'

সেরেছে! ভাবল রানা। সরকারী বাহিনীকে যদি এখানেই ভালমত বাধা দেয়া যায়, কেটেছেঁটে খাটো করে ফেলা যায়, তাহলে হয়তো বাঁচা যাবে। নইলে উপায় নেই। খোলা মাঠে ওদেরকে ইঁদুরের মত তাড়া করে ধরবে ব্যাটারা, শিঁকে গেঁথে রোস্ট বানাবে।

দ্রুত নির্দেশ দিতে শুরু করল রানা। 'শোভন! কয়েক রাউন্ড মর্টার নিয়ে রেডি হও। সময়মত ব্রিজ ওড়াতে হবে। সুমন্ত, তুমি ফিফটি সেভেনের দায়িত্ব নাও। হেভি এক্সপ্লোসিভ লোড করো। ওরা ব্রিজে উঠে এলে লীড ভেহিকলটা উড়িয়ে দেবে। তার আগে শোভনকে ওয়ার্নিং দিয়ে নেবে যাতে ও চার্জের সময় সেট করে নেয়ার সুযোগ পায়। হ্যানস, তুমি চারজন নিয়ে বাঁদিক কাভার করো। আলি, তুমিও চারজন নাও, ডানদিক কাভার করবে। আমার থার্টি ফোর নিয়ে যাও তুমি। নাউ, মুভ!'

চারজনকে ডেকে নিল শোভন, কয়েকটা মর্টার শেল ও প্রত্যেকটার জন্যে একটা করে গ্রেনেড নিয়ে ব্রিজের দিকে ছুটল। গ্রেনেডগুলো চারটে শেলের সাথে সেট করল সে। তারপর গ্রেনেডের পিন সোজা করে ওগুলোর সাথে দীর্ঘ লাইন জুড়ে নিল, যাতে নিজেদের অবস্থানে বসে সময়মত লাইনে টান দিলেই খুলে আসে প্রতিটা পিন। এবার শেল চারটে ব্রিজের দুপাশে, প্ল্যাঙ্কের নিচে খানিক পর পর সেট করল ও। কয়েক মিনিটের মধ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে 'ওকে' সঙ্কেত দিল সুমন্তকে। লাইন চারটে নিয়ে নদী তীরের বড় বড় বোল্ডারের আড়ালে আশ্রয় নিল।

আর চিন্তার কিছু নেই। সময়মত লাইন ধরে টান দেবে শোভন, পিন খুলে গেলে গ্রেনেড বিস্ফোরিত হবে, সেইসাথে মর্টারও। চোখের পলকে ধসে পড়বে ব্রিজ।

সরকারী সৈন্য বয়ে আনা গাড়িগুলো অনেক কাছে এসে পড়েছে, ধুলোর মেঘ

দেখা যাচ্ছে। এবার গাড়িগুলোকেও খালি চোখে দেখতে পেল সবাই। বেশি আহত যে-ক'জন ছিল, তাদেরকে আড়ালে রাখা ট্রাকে তোলা হলো যাতে প্রয়োজনের সময় দ্রুত সরে পড়া যায়। রূপাকে সংক্ষেপে পরিস্থিতি বুঝিয়ে হাফ-ট্রাক থেকে নামতে নিষেধ করল রানা, ফিরে এল ব্রিজের কাছে।

ওদিকে নিচু এক রিজের আড়ালে চলে গেছে সরকারী বহর। কাছে চলে এসেছে, লো গিয়ারে চলছে বলে গোঁ-গোঁ করছে এঞ্জিন। ওগুলোর দেখা পাওয়ার অপেক্ষায় আছে রানা। সব সময় যেমন হয়, এবারও প্রতীক্ষার সময় সুদীর্ঘ হলো। উত্তেজনায় ঘাম ফুটল ওর কপালে, নাকের নিচে। বড় বড় ফোঁটায় পরিণত হলো, গাল বেয়ে, জুলফি বেয়ে নিচের দিকে নামতে লাগল লাল, সূক্ষ্ম ধুলোর দেয়াল চিরে।

শুকনো ঠোঁট ভেজাল ও। 'ওই আসছে।'

লীড ট্রাকের গিয়ার বদলের আওয়াজ শুনল, তার একটু পরই দেখা দিল ওটা। ব্রিজে নামার তোড়জোড় শুরু করেছে।

রাগে ফুঁসছে সম্রাট লগুম্বার ডানহাত, সেনাপতি কর্নেল টোগো। শত্রু কে, সে জানে না। কেন তারা প্রেসিডেন্টকে হত্যা করল, তাও না। কাজটা করে ওরা তার ঝামেলা কমিয়ে দিয়েছে, সেজন্যে ওদের প্রতি তার কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু আলেক্সেইকে ধরে সমস্যা বাধিয়ে ফেলেছে ব্যাটারা। তাই রাগে ফুঁসছে সে। শহরে ঢোকার একটু আগেই ওয়্যারলেসে খবরটা পেয়ে অ্যামবুশ পেতেছিল সে। কিন্তু ওদের একটা গ্রুপকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে রুশ মেজরকে ধরে নিয়ে বেরিয়ে গেছে লোকগুলো। ওদের ধাওয়া করার জন্যে সংগঠিত হতেই পাক্কা এক ঘণ্টা লেগেছে তার। অবশ্য বেশিরভাগই ব্যয় হয়েছে আরও চারটে ট্রাক ও বাড়তি সৈন্য সংগ্রহ করার পিছনে। এ মুহূর্তে দুইশো একান্ত অনুগত সৈন্য আছে তার সাথে, আছে ছয়টা ট্রাক ও তার নিজের ল্যান্ড-রোভার।

অজ্ঞাত আক্রমণকারীদের ধরতেই হবে তাকে, মেজর আলেক্সেইকে উদ্ধার করতে হবে যে-কোন মূল্যে। নইলে এতদিনের গোপন পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেলে তার বেঁচে থাকাই অর্থহীন হয়ে পড়বে। তার সাথে রাশিয়ার কোন গোপন সম্পর্ক আছে, জানাজানি হওয়া চলবে না।

সম্রাট লগুম্বাকে খতম করে কিমশাকার ক্ষমতায় বসার স্বপ্ন তার দীর্ঘদিনের। অতীতে রাশিয়ার সাথে বেঈমানী করেছিল সে, সেটাকে পুঁজি করে তাদেরকে টোগো প্রস্তাব দিয়েছিল, আমাকে সমর্থন করো। আমি কিমশাকার প্রেসিডেন্ট হব, তোমাদের জন্যে আমার দেশের দ্বার অবারিত করে দেব। প্রস্তাবটা এক কথায় লুফে নেয় মস্কো, কারণ পশ্চিম আফ্রিকায় ভাল একটা ঘাঁটি প্রয়োজন ছিল তাদের।

কয়েক সপ্তাহ আগে ওদের সাথে গোপন চুক্তিতে সই করেছে টোগো। কথা ছিল দু'চার দিনের মধ্যেই সম্রাটের ব্যবস্থা করবে ও, সে জন্যেই কিমশাকার রুশ দূতাবাসের নতুন সামরিক অ্যাটাশে হয়ে এসেছিল আলেক্সেই। আসলে লোকটা

রুশ গোয়েন্দা সংস্থার মস্তবড় অফিসার। সেই লোক ধরা পড়ে গেছে সম্রাটের খুনীদের হাতে। সে যদি সত্যিই শেষ পর্যন্ত হাতছাড়া হয়ে যায়, অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে, তাদের গোয়েন্দা সংস্থার হাতে ধরা পড়ে, তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে। রাজধানীতে ফিরে সিংহাসন দখল করেও কোনও লাভ হবে না।

সাহায্য করা তো দূরের কথা, রুশ গোয়েন্দা সংস্থাই তখন তার সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে উঠবে। তাদেরকে অপদস্থ করার প্রতিশোধ নিতে প্রয়োজনে নরক পর্যন্ত তাড়া করবে টোগোকে। কিন্তু সে তা কিছুতেই হতে দেবে না। সব হাতের মুঠোয় এসে এভাবে বেরিয়ে যাবে, কিছুতেই তা মেনে নিতে পারে না সে। কাজেই ওদের নাগাল তাকে পেতেই হবে।

বিপক্ষের দলনেতার কথা ভাবল সে। লোকটা যে-ই হোক, এসব কাজে সে যে খুবই অভিজ্ঞ, তা বোঝা হয়ে গেছে কর্নেল টোগোর। গতরাতে তার পাতা অমন নিশ্ছিদ্র অ্যামবুশ যেভাবে ছিঁড়েখুঁড়ে সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে গেল সে, তা রীতিমত অবিশ্বাস্য। কৌতূহলের কারণে হলেও আলেক্সেইর মুখ খোলাবে লোকটা, টোগো সে ব্যাপারে নিশ্চিত—অবশ্য যদি এরমধ্যেই তাকে খুন করে না থাকে।

অমন কাজ হয়তো করবে না লোকটা। কেন করবে? তার সাথে ওই লোকের কিসের শত্রুতা? সম্রাটের সাথেই বা তাদের কি নিয়ে শত্রুতা ছিল? কেন তাকে হত্যা করল ওরা? রুশ মেজরের কথা ভাবল সে। ওই ব্যাটাই যত নষ্টের মূল। বারবার নিষেধ করার পরও প্রায় জোর করেই অ্যাম্বুশে অংশ নিতে গিয়ে ঝামেলাটা বাধিয়ে বসল। কি দরকার ছিল এর?

একটা গর্ত এড়াতে কড়া ব্রেক কষল তার ড্রাইভার, সেই সাথে হুইল ঘোরাল বন্ বন্ করে। ব্যাপারটা এতই আচমকা ঘটল, আরেকটু হলে ড্যাশবোর্ডে বাড়ি খেয়ে মাথা চৌচির হয়ে যেত কর্নেলের। রাগ সামলাতে না পেরে ঘুরেই ড্রাইভারের গালে ঠাস্ করে চড় মেরে বসল সে। তাতেও রাগ না কমায় আরেকটা মারল। 'জোরে চালা, ব্যাটা!' খেঁকিয়ে উঠল। 'কিন্তু দেখেশুনে

ব্রিজে নামার ঢালের মাথায় এসে থেমে দাঁড়াল সরকারী বাহিনীর লীড ভেহিকল একটা ব্রিটিশ ট্রাক, লেল্যান্ড নাক নিচু হলো ওটার, হেলেদুলে নেমে আসতে লাগল। এপারে দম বন্ধ করে বসে আছে রানা, সুমন্ত, শোভন, হ্যানস ও আলিসহ প্রত্যেকে। শত্রুর চোখের আড়ালে রয়েছে সবাই

একটু একটু করে ব্রিজের ওপর উঠল প্রথম ট্রাক, এগোতে শুরু করল ধীরগতিতে। তার পরপরই উঠল দ্বিতীয় ট্রাক কর্নেলের জীপ রয়েছে তৃতীয় ও চতুর্থ ট্রাকের মাঝখানে। প্রথম ট্রাক আর দশ গজ এগোলেই এপারে পৌঁছবে, ওটার পিছনেই দ্বিতীয় ট্রাক তৃতীয়টাও উঠি-উঠি করছে, এমন সময় আঘাত হানল সুমন্ত।

তার ৫৭ এমএম-এর হাই-এক্সপ্লোসিভ রাউন্ড প্রায় চুরমার করে দিল লেল্যান্ডের নাক, ড্রাইভার ও তার পাশে বসা সৈনিক কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রাণ হারাল প্রথম রাউন্ডটা ছিল অন্যদের জন্যে সঙ্কেত, সুমন্তর প্রথম রাউন্ডের

বিস্ফোরণ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছার আগেই অনেকগুলো আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল এপার থেকে। সবার লক্ষ্য ছিল একটাই, সবচেয়ে পিছনের ট্রাকের টায়ার ও ড্রাইভার। মুহূর্তের মধ্যে উদ্দেশ্য পূরণ হলো রানার, ফেঁসে গেল ওটা, অন্যগুলোর পিছানোর পথ রুদ্ধ হয়ে গেল।

ওদিকে হাতের মুঠোয় ধরা চারটে লাইনে হ্যাঁচকা টান মেরে গ্রেনেডের পিন খসিয়ে ফেলল শোভন, চার-চারটে ৬০ এমএম মর্টার শেল একযোগে বিস্ফোরিত হলো বিকট শব্দে। ঠিক মাঝখান থেকে দু'ভাগ হয়ে গেল ব্রিজ, দুটো ট্রাক ফাঁক গলে ডাইভ দিল দর্শনীয় ভঙ্গিতে। নিচের পাথরের সাথে ওগুলোর সংঘর্ষের ভয়াবহ শব্দে গাল আপনাআপনি কুঁচকে উঠল রানার।

প্রায় একই সাথে ভেসে এল আহত সৈন্যদের গগনবিদারী আর্তচিৎকার। ওপর থেকে মেশিনগান ও অটোম্যাটিক রাইফেলের বিরতিহীন গুলিবৃষ্টি তাদের সমস্ত যন্ত্রণা ঘুচিয়ে দিল। সামনের অবস্থা দেখে বাকি চার ট্রাক ও টোগোর জীপ জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। সৈন্যরা ঝুপঝাপ লাফিয়ে নেমে আতঙ্কিত শেয়ালের মত আশ্রয়ের খোঁজে ছুটল। সেই মুহূর্তে দ্বিতীয় দফা গুলি বর্ষণ শুরু করল রানার কমান্ডো বাহিনী।

দেখতে দেখতে চারটে ট্রাকই ঝাঁঝরা হয়ে গেল, যা কিছু নড়ছিল, সব স্থির। ব্যারেল সামনে পিছনে, ডানে-বাঁয়ে করে রিভার বেডের সমস্ত নড়াচড়াও থামিয়ে দিয়েছে ওরা। সব মিলিয়ে প্রায় একশো ষাটজন সৈন্য হয় খতম, নয়তো চিরতরে অকেজো হয়ে গেল এই ধাক্কায়। কিছু ওপরে, কিছু নিচে যারা বেঁচে ছিল আহত অবস্থায়, কষ্ট থেকে রেহাই দিতে একের পর এক গ্রেনেড চার্জ করা হলো তাদের ওপর

একটা গিয়ে পড়ল চতুর্থ ট্রাকের নিচে। পড়েই ফাটল ওটা, সঙ্গে ট্রাকটার ফুয়েল ট্যাঙ্কও। আগুন ধরে গেল ট্রাকে। ভেতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল আত্মগোপন করে থাকা তিনজন সৈন্য, সারা গায়ে আগুন জ্বলছে তাদের। উন্মত্তের মত চিৎকার করছে লোকগুলো, এলোপাতাড়ি ছোটাছুটি করছে অন্ধের মত কয়েকটা বুলেট খরচ করে এই নরক যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেয়া হলো তাদেরকে। চোখের সামনে পুড়ে, কুঁকড়ে কয়লা হয়ে গেল দেহগুলো। করডাইটের গন্ধ চাপা পড়ে গেল কাঁচা মাংস পোড়ার উৎকট দুর্গন্ধে।

ওদিকে কর্নেল টোগো চেঁচিয়ে তার লোকদের গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দিচ্ছে, কিন্তু খুব একটা কাজ হচ্ছে না তাতে। হারানো সাহস পুনরুদ্ধার করতে পারছে না তারা। কিন্তু সে সামলে নিয়েছে, কারণ বুঝে ফেলেছে শত্রুপক্ষের হাতে তাকে দেয়ার মত আর কোন চমক অবশিষ্ট নেই ওদের ভাণ্ডার শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তার ভাণ্ডারে আছে। টোগো বুঝে ফেলেছে দলটার কাছে অন্তত একটা ৫৭ এমএম রিকয়েললেস রাইফেল আছে, কিন্তু তার কাছে আছে প্রায় দ্বিগুণ শক্তির। কি করে ওই জিনিসের কাছ থেকে সর্বোচ্চ সুবিধে আদায় করতে হয়, তাও ভাল জানে সে।

তার নির্দেশ পেয়ে শেষের ট্রাক থেকে একটা দীর্ঘ টিউব বের করল

কয়েকজন সৈন্য, কাছের এক পাহাড়ে নিয়ে ট্রাইপডের ওপর সেট করা হলো সেটা। একটা রাউন্ড লোড করা হলো, সাইটে চোখ রেখে লক্ষ্য ঠিক করল গানার, ট্রিগার টেনে দিল। ১০৬ এম এম শেল উড়ল বিকট 'বুম্‌ম্‌' শব্দে।

পরিস্থিতি বোঝার জন্যে সবে উঠে দাঁড়িয়েছিল শোভন, ঠিক ওর দু'পায়ের মাঝখানে পড়ে বিস্ফোরিত হলো ওটা। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল যুবক, শূন্যে উঠে চতুর্দিকে ছুটল ওর হাড়-মাংস, ক্যামোফ্লেজড ইউনিফর্ম। আস্ত মাথাটা উড়ে গিয়ে পড়ল নিচের রিভার বেডে, পড়েই খোসা ছাড়ানো নারকেলের মত ঠাস্‌ করে ফেটে কয়েক টুকরো হয়ে গেল। অল্প সময়ের মধ্যে পর পর আরও পাঁচ সঙ্গী হারাল রানা। ডান এবং বাঁ, দু'দিক থেকেই টোগোর ইনফ্যান্ট্রি প্রচণ্ড পাল্টা হামলা শুরু করায় সমস্যায় পড়ে গেল ওরা।

এ তরফের গোলাগুলি উপেক্ষা করে এক প্লাটুন সৈন্য খরগোশের মত লাফাতে লাফাতে নদীতে নেমে চোখের আড়ালে চলে গেল। রানার ভয় হলো যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন দিক থেকে ওপরে উঠে আসবে লোকগুলো। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও—অনেক হয়েছে, বাঁচতে হলে এই মুহূর্তে সরে পড়তে হবে এখান থেকে।

'সীজ ফায়ার!' গলার পুরো শক্তি এক করে চেঁচিয়ে উঠল ও। 'পালাও সবাই! কাভারিং ফায়ারের প্রয়োজন নেই, স্রেফ দৌড়ে গিয়ে ট্রাকে উঠে পড়ো। হারি আপ! হারি আপ!'

আরেকটা ১০৬ তীক্ষ্ণ শিস তুলে ছুটে গেল ওর মাথার ওপর দিয়ে। বিস্ফোরণের আওয়াজের পরপরই আহতদের বুকফাটা চিৎকারে ভারী হয়ে উঠল পরিবেশ। দৌড়ে জায়গাটা পার হওয়ার সময় মুহূর্তের জন্যে থামল ও। আরও তিনজন গেছে একজন অবশ্য বেঁচে আছে এখনও, কিন্তু ওপরপেট থেকে তলপেটের একদম নিচ পর্যন্ত পুরো হাঁ হয়ে আছে তার। ছেঁড়াখোঁড়া নাড়িভুঁড়ি বাইরে ছড়িয়ে আছে রক্তাক্ত ফিতের মত।

তাকে মুক্তি দেয়ার একটাই পথ আছে, তাই করল রানা। রাইফেলের এক গুলিতে এত কষ্ট থেকে রেহাই দিল লোকটাকে। আবার দৌড় শুরু করতে যাচ্ছিল, এমনসময় সঙ্গীদের কয়েকজনকে কাভারিং ফায়ার করার জন্যে হন্তদন্ত হয়ে প্রস্তুতি নিতে দেখে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। দৌড়ে গিয়ে তাদের একজনের পাছায় কষে এক লাথি মারল ও, টেনে চড় কষাল আরেকজনের কান বরাবর।

'পালা, হারামজাদার দল!' চিৎকার করে উঠল ভয়তাড়িত তীক্ষ্ণ গলায়। 'সময় নষ্ট করতে নিষেধ করেছি না?'

কাজ হলো, গাড়িগুলোর অবস্থানের দিকে ছুটল তারা পড়িমরি করে। ততক্ষণে সংখ্যার দিক থেকে অর্ধেকে নেমে এসেছে রানার সৈন্য সংখ্যা। হুড়মুড় করে যে যার গাড়িতে উঠে বসল এদিকে গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দে ভয়ে গাড়ি থেকে নেমে কিছু বোল্ডারের আড়ালে গিয়ে বসেছিল রূপা, রানাকে দূর থেকে তুফান বেগে উড়ে আসতে দেখে দুই লাফে হাফ-ট্রাকের কাছে পৌঁছে গেল। দ্রুত ক্যাবে উঠে দরজা পুরো মেলে রাখল রানার জন্যে।

সেকেন্ডের মধ্যে এসে পড়ল ও, প্রায় একইসাথে স্টার্ট নিল সবক'টা গাড়ি, সগর্জনে দক্ষিণে ছুটল। 'কি অবস্থা?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল রূপা।

জানালা দিয়ে হাত বের করে অন্য গাড়িগুলোকে আরও জোরে ছোটার জন্যে তাড়া লাগাচ্ছিল ও, প্রশ্ন শুনে ঘুরে তাকাল। 'খুব খারাপ। বেশ কয়েকজনকে হারিয়েছি আমরা। শোভনকেও।'

'শোভন···মারা গেছে!' ফিসফিস করে বলল রূপা। ছেলেটার চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠল। এই তো একটু আগেই ওকে হেঁটেচলে বেড়াতে দেখেছে ও। সেই ছেলে নেই, বিশ্বাস করতে পারছে না।

কর্নেল টোগো ওদিকে তার পরবর্তী করণীয় শুরু করে দিল। গানারকে সাইট উঁচু করে ম্যাক্সিমাম রেঞ্জে গোলাবর্ষণের জন্যে প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিল। প্রথমটা মিস করল গানার; কিন্তু দ্বিতীয়টা সোজা এসে পিছনের হাফ-ট্রাকটার ওপর পড়ল। বিস্ফোরণের ধাক্কায় মাটি ছেড়ে উঠে পড়ল ওটা। একমাত্র ড্রাইভার বেঁচে গেল। পিছনে যারা ছিল, প্রত্যেকে মরল। তাদের আকৃতি এমনভাবে বিকৃত হয়ে গেছে, দেখে মনেই হয় না কোনদিন তারা মানুষ ছিল। ওর মধ্যে জর্জ আর ইউসুফও আছে। খবরটা জানা ছিল না রানার। দ্রুত ঘুরে গেল পূর্ণ গতিতে ছুটন্ত সালাদিন, ড্রাইভার লোকটাকে তুলে নিয়ে পনেরো সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে ফিরে এল পথে। তুমুল গতিতে ছুটল সামনের দিকে।

দুই কোমরে হাত রেখে হাসছে কর্নেল টোগো। শব্দ করে। জ্বলন্ত হাফ-ট্রাকের তেলতেলে কালো ধোঁয়া শত্রু বাহিনীকে তার চোখের আড়াল করে রেখেছে এ মুহূর্তে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। সে জানে, আবারও রক্ত ঝরিয়েছে সে। যে ক'জন এখনও বেঁচে আছে, তারাও শেষ হলো বলে। পালিয়ে যাবে কতদূর?

এখান থেকে ছয় মাইল দক্ষিণে একটা ক্রসিং আছে। ওখানে সে সহজেই পাকড়াও করতে পারবে শয়তানের দলটাকে, সে-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই তার। ও ব্যাটাদের ধরে খতম করবে, তারপর নির্বোধ রাশিয়ানকে উদ্ধার করবে অবশ্য যদি এখনও বেঁচে থাকে সে। মরে গিয়ে থাকলে তো কোন কথাই নেই। যন্ত্রণা গেছে।

'মেজর মাসুদ রানার ইউনিটের কোন খবর পাওয়া গেছে?' মেজর ফরবস্‌কে প্রশ্ন করল বিসিআইয়ের হারারে চীফ শহীদ আহমেদ। ঘুমের অভাবে টকটকে লাল তার চোখ।

উত্তর দেয়ার সময় দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটল লোকটার চেহারায়। 'নাহ্! কোন খবর নেই এখনও। ব্যাপারটা মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না আমার। দুটো পিক-আপ স্পটের একটাতেও যাননি মেজর, বা তাঁর সঙ্গীদের কেউ।'

দু'দিনের না কমানো খোঁচা খোঁচা দাড়ির মধ্যে দিয়ে খস্‌খস্ করে গাল চুলকাল শহীদ। বিড়বিড় করে বলল, 'ঠিকই বলেছেন আপনি। এর মানে কোথাও মারাত্মক কোন গণ্ডগোল ঘটে গেছে। মনে হচ্ছে আপনার কিমশাকা সোর্সের

''গুজবটা'' হয়তো সত্যি।'

'লগুম্বার সাথে মস্কোর গোপন সম্পর্কের কথা বলছেন? হতে পারে।'

নতুনভাবে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল মেজর ফরবস। যে করে হোক জানতেই হবে কি ঘটেছে কিমশাকায়। কেন মেজর মাসুদ রানার সাড়া নেই?

পাঁচ

বহরের একটা গাড়ি কমে গেছে, বাকি তিনটায় করে সঙ্গীদের নিয়ে প্রাণপণে ভাগছে মাসুদ রানা। একটা হাফ-ট্রাক, সালাদিন আর্মার্ড কার ও একটা ট্রাক, যত দ্রুত সম্ভব ছুটছে। রানা বুঝতে পারছে একটু থামা দরকার, আহতদের অন্তত ফার্স্ট এইড দেয়া দরকার, কিন্তু পারছে না। এখন এক মিনিট দেরি করা মানেই কর্নেল টোগোকে এক মিনিটের ব্যবধান কমিয়ে আনতে সাহায্য করা।

আহতরা ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে, চিৎকার করছে, তবু কিছু করার নেই ওর। থামলে ওরাও মরবে, অন্যরাও। কেবল রিফুয়েলিঙের প্রয়োজন হলে থামতে হচ্ছে কিছু সময়ের জন্যে, ক্রমে ফুরিয়ে আসতে থাকা স্টক থেকে ট্যাঙ্কে ফুয়েল ঢেলেই আবার দে দৌড়।

তারপরও অবশ্য এক গ্রামে থামতে হয়েছিল। পথের পাশে ১৯৫৯ মডেলের একটা শেভি স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে দেখে কৌতূহলী হয়ে থেমেছিল রানা। গাড়ির মালিক কাছেই ছিল–ভারতীয়। দরজা ফেন্ডার কিছুই নেই, তবু ওটাই যে তার অহঙ্কার কথায় কথায় তা বুঝিয়ে দিতে কসুর করেনি সে। নগদ টাকায় তার শেষ ফোঁটা পর্যন্ত ফুয়েল কিনে নিয়েছে রানা।

বেশি নয়, চোদ্দ গ্যালনের মত ছিল দুই জেরি ক্যান ও শেভির ট্যাঙ্কে বিক্রি করতে চাইছিল না লোকটা, কিন্তু ওদের চেহারা-সুরত দেখে 'না' বলার সাহস পায়নি। ওটুকুতে একবার রিফুয়েল করা যাবে গাড়ি তিনটা, তারপর আল্লাহ ভরসা। গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলে ছুটছে বহর। ওদেরগুলো ছাড়া ট্রাফিক প্রায় নেইই এদিকে, একটা-দুটো জোড়াতালি মারা বাই-সাইকেল ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়েনি রানার।

লোকজনের চেহারা দেখে বোঝা গেছে লগুম্বার মৃত্যুর খবর পৌঁছে গেছে এদিকে। খুব সম্ভব ট্রেডিং পোস্টের রেডিওর মাধ্যমে ছড়িয়েছে। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া নেই, সবাই একদম নির্বিকার।

সূর্য ডুবে যাওয়ার একটু আগে আরেকবার গাড়ি থামানোর নির্দেশ দিল রানা অনেকক্ষণ পর্যন্ত সবুজের ছোঁয়াও ছিল না মাটিতে, এখানে আছে সামান্য দুয়েকটা জ্যান্ত ঝোপ, কিছু ছাড়া ছাড়া গাছ, শাক-সবজি। ওদের সামান্য দূরে দল বেঁধে বিশ্রাম নিচ্ছে দু'দল সিংহ, গাড়ির আওয়াজে বিরক্ত হয়ে ঘুরে তাকাল। ওইটুকুই, আর কোন আগ্রহ দেখাল না ওগুলো।

আরও দূরে গাছের পাতা খাচ্ছে একদল জিরাফ, হাঁটু সমান উঁচু হলুদ ঘাসের মধ্যে চরে বেড়াচ্ছে গ্যাজেল হরিণ। সিংহের দিকে সতর্ক নজর রেখেছে ওরা। কিছু শুয়োর ও হায়েনাও দেখা গেল। চমৎকার দৃশ্য সব মিলিয়ে, কিন্তু এখন তা উপভোগ করার সুযোগ নেই।

কয়েকটা ছোট ছোট ক্রাল বা গ্রাম অতিক্রম করল ওরা। মাটির দেয়াল ও শনের ছাদওয়ালা ঘর, তার সামনে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছে বয়স্ক পুরুষরা। মহিলারা গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ত, ছেলেরা খেলায়। মাঝেমধ্যে কোণ আকৃতির টিনের চালওয়ালা ঘরও আছে দেখা গেল। ওগুলো ভারতীয় ট্রেডারদের। প্রত্যেকে কাজ বন্ধ করে তাকিয়ে থাকল গাড়ির দিকে নির্বিকার চাউনি। এক বিন্দু আগ্রহও দেখা গেল না কারও মধ্যে। গাড়ির ওড়ানো ধুলোয় চেহারা লালচে হয়ে উঠল, তবু নড়ল না ওরা।

আনন্দ বা ঘৃণা, কোনটাই নেই চাউনিতে। কারণ এরা খুব ভালই জানে কখন প্রতিক্রিয়া দেখাতে হয়, কখন হয় না। তার ওপর দেখাই যাচ্ছে মানুষগুলো বিদেশী, সশস্ত্র, একেকজনের গায়ের রং একেক রকম, ওদিকে প্রেসিডেন্ট যমের বাড়ি গেছে, কাজেই যোগাযোগটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। এরকম একদল লোকের ব্যাপারে কৌতূহলী হওয়ার দরকারটা কি?

শেষ ক্রালের প্রান্তে একটা কুয়ো মত দেখে থামার নির্দেশ দিল রানা। বিশ্রাম ও আহতদের চিকিৎসা, দুটোরই জরুরী প্রয়োজন। ভাগ্যই বলতে হবে কারণ আহতদের কারও জখমই তেমন গুরুতর নয়। পেটে বা মাথায় আঘাত লাগেনি কারও। গোলাগুলির ক্ষেত্রে ওই দুই জায়গাই মারাত্মক পেনিসিলিন ও সালফা ড্রাগ নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেডিক।

চিকিৎসা পেতে দেরি হওয়ার কারণে কেউ লীডারকে দায়ী করল না। কারণ শত্রুর অতবড় এক বাহিনীর সাথে মুখোমুখি লড়াই করে এখনও যে বেঁচে আছে, তাতেই ওরা খুশি এবং এই কৃতিত্বের প্রায় পুরোটাই লীডারের। হতাহতের সংখ্যা একটু বেশিই হয়ে গেছে যদিও

এগারোজন মৃত, পাঁচজন আহত। এত হত না যদি শত্রুর কাছে ১৬০ এমএম না থাকত। তারপরও ওদেরই বেশি ক্ষতি হয়েছে প্রথম ধাক্কাতেই চার ভাগের তিনভাগ সৈন্য পরপারে চলে গেছে, এই সান্ত্বনা নিয়েই তারা খুশি।

কুয়ো থেকে লেদার বাকেটে করে তোলা পানিতে ভাল করে হাতমুখ ধুয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। পাঁচ বছর আগে এক মার্কিন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন খুঁড়েছে এই কুয়ো। রুমালে মুখ মুছে সামনে তাকাল ও, দেখল হ্যানস ল্যাংসডর্ফের চেহারা বদলে গেছে। ওর দিকেই আসছে লোকটা, দুহাত দেহের পাশে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ঝুলছে। যেন ও-দুটো নিয়ে কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। পাকস্থলীতে একটা গিট অনুভব করল রানা।

'কি হয়েছে, হ্যানস?'

'খবরটা কিভাবে জানাব বুঝতে পারছি না, ফ্রেন্ড মানে...'

নিশ্চয়ই কোন খারাপ খবর নিয়ে এসেছে লোকটা এবং সেটা ওরই কোন

ঘনিষ্ঠজনের মৃত্যুসংবাদ। কে? ভাবল রানা।

'গো অ্যাহেড, হ্যানস। ইট'স ওকে।'

মুখ খুলতে যাচ্ছিল সে, এমন সময় সালাদিনের টারেট থেকে ডেকে উঠল সুমন্ত। 'মাসুদ ভাই, ইউসুফ কোথায়?'

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। যাক, সুমন্ত নয় তাহলে। ইউসুফও নয়। ওরা দুজনেই রানার সমান প্রিয়, সমান স্নেহের। জবাবটা দিল হ্যানস।

'পিছনের হাফ-ট্র্যাকে ছিল ইউসুফ,' কর্কশ গলায় বলল। 'শুধু ড্রাইভার বেঁচেছে ওটার। অন্যরা···!'

চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল সুমন্তর, দু'গাল বেয়ে পানির ধারা নামল। সূর্যের শেষ আলোয় চিক্‌চিক্ করছে।

'আমি পিক্ করেছি লোকটাকে,' হ্যানস বলল আবার। 'হাফ-ট্র্যাকের পিছনে যারা ছিল তাদের চেনার কোন উপায় ছিল না। ইউসুফ আর জর্জ ওদের মধ্যে ছিল,' শেষ বাক্যটা মৃদু গলায় বলল, যেন রানা-সুমন্তর শোকের কিছু অংশ নিজের করে নিতে চাইছে।

চোখের পাতা টিপ্‌টিপ্ করে উঠল রানার। জীবনে অসংখ্য মৃত্যু দেখেছে ও, এত ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারিয়েছে যার কোন হিসেব নেই। সবগুলোই দুঃখজনক, কিন্তু নতুন এই ক্ষতটা কিছু সময়ের জন্যে অভিভূত করে ফেলল ওকে। গলার মধ্যে কিসের একটা দলা আটকে থাকল অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

নিজেকে সামাল দিতে প্রচুর সময় লাগল। এখন শোক করার সময় নয়, উপায় নেই। এখনও ওর নেতৃত্বে রয়েছে অনেকে, তাদের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে ওকে। সরে পড়তে হবে সবাইকে নিয়ে। কিন্তু যতই নিজেকে বোঝাক, কাজ হলো না। সুস্থ মাথায় চিন্তা করার ক্ষমতা ফিরে পেতে বেশ অনেক সময় লেগে গেল ওর।

রোল কল করল ল্যাংসডর্ফ, পাঁচজন আহতসহ মোট সংখ্যা দাঁড়াল চোদ্দয়। বেশ ছোট হয়ে গেছে দল। এক হামলাতেই সাতজন শেষ। এ ধরনের আরেকটা লড়াইয়ের মোকাবিলা করতে গেলে কি হবে অনুমান করতে কষ্ট হলো না কারও, বিশেষ করে যেখানে ১০৬ এমএম রয়েছে কর্নেল টোগোর হাতে। সৈন্য সংখ্যার দিক থেকেও যথেষ্ট ওপরে আছে সে।

রানার অনুমান, এ-মুহূর্তে বারোটসিল্যান্ড থেকে ত্রিশ মাইল মত দূরে আছে ওরা। যদি কষ্টেসৃষ্টে দূরত্বটা অতিক্রম করা যায়, বর্ডারে পৌঁছতে পারে, তাহলে হয়তো ক্ষান্ত দেবে কর্নেল টোগো। কিন্তু 'হয়তো'র ওপর নির্ভর করে থাকতে রাজি নয় ও।

রিয়ার গার্ড হিসেবে দু'জনকে পাঠাল ও, অন্যদেরকে প্রতিটা ক্যান্টীন ভর্তি করে খাবার পানি নেয়ার নির্দেশ দিয়ে হ্যানসের দিকে ফিরল। 'এবার লোকটার সাথে কথা বলা যায়। নিয়ে এসো।'

জার্মান লোকটার ডাকার ভঙ্গি দেখে প্রমাদ গুণল মেজর আলেক্সেই। বাঁধন খোলা হতে নেমে এল সালাদিন আর্মার্ড কার থেকে। রানার সাথে চোখাচোখি

হওয়ামাত্র বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড জমাট বেঁধে যাওয়ার অবস্থা হলো তার। কঠিন, নিষ্ঠুর চেহারাটা দেখেই বুঝল, এ লোক আর যা-ই হোক, অন্তত যুদ্ধবন্দীর মর্যাদা তাকে দেবে না।

নজর ঘুরিয়ে ল্যাংসডর্ফকে দেখল সে কাছ থেকে। আরও দমে গেল মন কাটাকুটির দাগ ভরা প্রকাণ্ড ক্রাউটটাকে আরও বিপজ্জনক মনে হলো তার। ও পারে না দুনিয়াতে এমন কিছু আছে কি না ভাবল আলেক্সেই। মনে হলো নেই দুজন একই প্রকৃতির। এদের কাছে না জানার ভান করে লাভ হবে না। প্রশ্নের জবাব দিয়ে সন্তুষ্ট করা না গেলে কপালে দুঃখ আছে। মুখোমুখি হলো সে ওদের

'নাম?' ছোটখাট হুঙ্কার ছাড়ল রানা। গম্ভীর চেহারায় পর্যবেক্ষণ করছে ওকে। পাঁচ ফুট হবে সে দৈর্ঘ্যে, হালকা-পাতলা গড়ন। মুখটা সরু। চোখের রঙ হালকা নীল সাদামাঠা চেহারা, আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

'মেজর আলেক্সেই।'

'পুরো নাম!'

'ইগর আলেক্সেইভিচ আলেক্সেই,' এমনভাবে উচ্চারণ করল সে, যেন মুখের মধ্যে বিস্বাদ ঠেকছে।

'এ দেশে উপস্থিতির কারণ?'

'আমি কিমশাকার রুশ এমব্যাসির মিলিটারি অ্যাটাশে।'

'ওরফে?' ঘোঁৎ করে উঠল প্রকাণ্ডদেহী জার্মান।

চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকাল সে। 'দা?'

'ও জানতে চাইছে আর কি? রুশ ইন্টেলিজেন্সের কোন ব্রাঞ্চের?' রানা বলল

চুপ মেরে থাকল লোকটা। নজর ঘুরছে রানা-ল্যাংসডর্ফের মুখের ওপর। পরেরজন এতক্ষণ এমনভাবে তাকে দেখছিল, যেন সে এক টুকরো লোভনীয়-স্টেইক। কিন্তু ভুলটা ভেঙেছে ওর মধ্যে ছুঁচলো কাঁটা আছে টের পেয়ে, চেহারা বদলে গেছে মুহূর্তে

মত পাল্টাল মেজর। হাজার চেষ্টা করলেও এদের কাছে আসল তথ্য লুকিয়ে রাখতে পারবে না সে, ইচ্ছে করলে এরা ঠিকই বের করে নিতে পারবে। কিন্তু তখন পরিস্থিতি থাকবে ভিন্ন। শুধু শুধু অপদস্থ হয়ে লাভ কি? অতএব মুখ খুলল সে। সংক্ষেপে যা বলল, মোটামুটি তা এরকম: অতীতে এ অঞ্চলে অ্যাঙ্গোলা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধু। কমিউনিজমের পতনের পর সে সম্পর্ক অস্তিত্ব হারিয়েছে, তাই নতুন বন্ধু খুঁজছিল মস্কো।

এই সময় কিমশাকা বন্ধুত্বের হাত বাড়াল, এক কথায় রাজি হলো তারা। এই পর্যায়ে বাধা দিল রানা। 'কিমশাকার সাথে অতীতে বন্ধুত্ব ছিল রাশিয়ার। এখন নেই। ওরা তোমাদের লাথি মেরে বের করে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সেটা লোক দেখানো,' বলল মেজর। ভেতরে যে আরও কিছু আছে, তা চেপে গেল।

'বুঝলাম। তারপর?'

'ওরা বলল, অস্ত্র, সামরিক যান, কল কারখানার যন্ত্রপাতি ইত্যাদির বিনিময়ে

ওদের বন্ধুত্ব অর্জন করতে পারি আমরা। ওরা দেবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডায়মন্ড, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, কপার এবং ইউরেনিয়াম।'

'আর?'

শ্রাগ করল মেজর। 'এই জন্যেই এদেশে এসেছি আমি চুক্তিতে সই করতে।'

'এ ধরনের চুক্তি হয় ট্রেড মিনিস্ট্রির মাধ্যমে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আর্মির এক মেজরকে কেন পাঠাল মস্কো?'

জবাব নেই

'কর্নেল টোগোর সাথে কোত্থেকে আসা হচ্ছিল?'

'রাজধানীর বাইরে এক বিদ্রোহ দমন করতে গিয়েছিল সে। আমিও গিয়েছিলাম তার সাথে।'

'সেটা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার তার মধ্যে বাইরের একজনকে কেন অন্তর্ভুক্ত করল কর্নেল? সম্রাটই বা কেন অনুমোদন করল?'

'সম্রাট জানতেন না,' বলেই মনে মনে জিভ কাটল আলেক্সেই। বুঝল বেশি বলা হয়ে গেছে।

'এর অর্থ টোগোর সাথে আপনার বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে,' বলল রানা। 'অ্যাম আই রাইট?'

দুই কোমরে হাত রেখে ভুরু নাচাল হ্যানস। 'সিঙ্কিং সিঙ্কিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার মনে হচ্ছে?'

মেজর নিরুত্তর।

তাকে একটু দম নেয়ার সুযোগ দিতে তখনকার মত রেহাই দিল রানা। সুমন্তর হাতে তুলে দিয়ে বাঁধাছাঁদা করার আগে কিছু খাইয়ে নেয়ার নির্দেশ দিল। একবার যখন মুখ খুলেছে, তখন সবই জানা যাবে, ভাবল রানা। কাজেই এখনই বেশি চাপাচাপি করার বিশেষ প্রয়োজন নেই। পরে জানলেও চলবে।

তবে জানতে হবে। কর্নেল টোগোর সাথে এর কি সম্পর্ক, সেটা কত গভীর, দুজনে কোন ফাউল গেম খেলছে কি না জানা জরুরী। যদি শেষেরটা 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে বোঝা যাবে কর্নেলের কাছে এই লোকের প্রাণের মূল্য কতখানি। যদি বেশি হয়, তাহলে একে বিনিময়ের মাধ্যমে হয়তো নিজেদেরকে এই অপ্রত্যাশিত গেরো থেকে উদ্ধার করতে পারবে রানা।

কিন্তু আপাতত অন্য কাজ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। তিনজনকে আশপাশের গ্রামগুলো ঘুরে আসার জন্যে লোক পাঠাতে বলল ও হ্যানসকে, খাবার-গ্যাসোলিন কিছু জোগাড় করা যায় কি না খুঁজে দেখবে। কাজটা সারা হতে তাকে নিয়ে আহতদের দেখতে গেল রানা। লোকগুলোর কারও ক্ষতই তেমন মারাত্মক নয় দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের সাথে দুয়েকটা কথা বলল। ভালমন্দ খোঁজ-খবর নিল।

সবশেষে চলল হাফ-ট্রাকের দিকে। তখনই বুদ্ধিটা এল মাথায়। 'হ্যানস,' ঘুরে দাঁড়াল ও। 'এমনিতেই ফুয়েলের স্টক ফুরিয়ে এসেছে, তার ওপর এই হাফ-ট্রাকটা খুব স্লো অথচ তেল খায় বেশি। ওটায় ফুয়েল যা আছে বের করে নাও পুড়িয়ে ফেলো গাড়িটা, টোগো যাতে ব্যবহার করতে না পারে।'

'বেশ।' কয়েকজনকে নিয়ে তখনই কাজ শুরু করে দিল লোকটা।

এরপর পাইলট হ্যারল্ডকে খুঁজে বের করল রানা। সালাদিনের সামনের টায়ারে মাথা রেখে ঘুমাবার আয়োজন করছিল লোকটা। চেহারার সার্বক্ষণিক পরিপাটি ভাবটা অনেক আগেই খুইয়েছে সে, এখন দেখলে মনে হয় এইমাত্র একপাল শুয়োর চরিয়ে ফিরেছে বুঝি। ঘামে ভিজে গায়ের সাথে লেগে আছে শার্ট। ঘাড়ে, মুখে, হাতের পিঠে জমে থাকা ধুলো ভিজে কাদা হয়ে গেছে, তার মধ্যে গালে দু'দিনের না কামানো কাঁচাপাকা দাড়ি। সব মিলিয়ে কিম্ভূত মার্কা চেহারা হয়েছে।

'উঠে পড়ো, হ্যারল্ড,' বলল ও। 'জরুরী কাজ আছে।'

'মাই গড, ম্যান!' ব্যথিত চেহারায় বলল লোকটা। 'আমার জন্যে কি একটুও দয়া-মায়া নেই তোমার অন্তরে? তুমি জানো আমি তোমাদের মত কাটখোট্টা নই, ভদ্রলোক। পাইলট।'

হাসল রানা। 'আমি জানি। ভদ্রলোক বলেই তো তোমাকে আমার বেশি প্রয়োজন। ওঠো।'

বিরক্ত চেহারায় উঠে পড়ল সে। 'বলো। কি এমন সমস্যায় পড়েছ যা আমাকে ছাড়া মেটানো যাচ্ছিল না?'

লোকটাকে একটা সিগারেট অফার করল ও, নিজেও ধরাল। 'অ্যামিউনিশন কি পরিমাণ আছে গুনে দেখবে প্রথমে, সবার মধ্যে সমান ভাগ করে দেবে ওগুলো। তারপর সালাদিন ও ট্রাকটা চেক করবে, যদি কোনটার কোথাও ফিক্সিং করতে হয় করবে।'

'হাফ-ট্রাকটা বাদ থাকল কেন?' একগাল ধোঁয়া ছেড়ে জানতে চাইল ইংরেজ পাইলট। 'কি দোষ করেছে ওটা?'

'খুব স্লো চলে, তাই ওটা বাদ। ফেলে রেখে যাব। যা হোক, শুরু করে দাও কাজ। সময় আধঘণ্টা। এরমধ্যে সব শেষ করা চাই।'

জবাবের অপেক্ষা না করে হাফ-ট্রাকের দিকে এগোল ও, দরজা খুলে ডাকল রূপাকে। 'নেমে এসো।'

বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল ও, রানার সাড়া পেয়ে চমকে উঠে ঘুরে তাকাল। 'কেন?'

'তোমাকে নিয়ে ইভনিং ওয়াকে বেরোব।'

'কি?'

'আহ্, এসো তো!' ওর হাত ধরে টানল রানা। 'এভাবে একনাগাড়ে বসে থাকলে শেকড় গজিয়ে যাবে।'

'না, না! এত লোকের সামনে যেতে আমার খুব লজ্জা করছে,' নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে টানা হ্যাঁচড়া শুরু করে দিল রূপা 'ছাড়ো, রানা!'

'কেন লজ্জা করছে, শুনি?' ছাড়ল না ও। 'তুমি ভেবেছ ওরা সবাই তোমাকে ন্যাংটো অবস্থায় দেখে ফেলেছে?'

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল রূপা। 'ছি, কী জঘন্য ভাষা!' চাপা গলায় বলল।

'শোনো, তুমি সেই প্রথম থেকে মারাত্মক এক ভুল ধারণা নিয়ে আছ, অনর্থক কষ্ট দিচ্ছ নিজেকে। আমি আর হ্যানস যখন লগুম্বার বেডরূমে ঢুকি, ভেতরে তখন প্রায় অন্ধকার ছিল, প্রথমে তো ঠিকমত দেখতেই পাইনি কিছু। পরে অবশ্য একটু একটু দেখতে পেয়েছি, কিন্তু কি দেখেছি কিচ্ছু মনে নেই। আমাদের নজর তখন তোমার ওপর ছিল না, ছিল লগুম্বার ওঁপর। তারপর তো আমরা তাকে খতম করার আগেই তুমি আড়ালে চলে গিয়েছিলে। এখন তুমিই বলো, এর মধ্যে তোমার লজ্জায় মরি মরি হওয়ার মত এমন কি আছে?'

জোরাজুরি বন্ধ হয়ে গেল রূপার। কয়েক মুহূর্ত ভাবল কি যেন। 'সত্যি? কিছু দেখতে পাওনি?'

'পাইনি,' নিরীহ মুখভঙ্গি করে বলল রানা। 'পেলে এতক্ষণও তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছি না কেন? বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করে দেখো, তোমার কোথায় কি আছে কিচ্ছু বলতে পারব না।'

ভুরু কুঁচকে তীব্র দৃষ্টি হানল রূপা। 'অসভ্য কোথাকার! যা মুখে আসে, আটকায় না কিছু!'

'দুঃখিত। কিন্তু এখন বুঝতে পারছ তো তুমি শুধু শুধু...'

'কিন্তু ওই লোকটা, হ্যানস, না কি? ও নিশ্চয়ই সঙ্গীদের কাছে রটিয়ে দিয়েছে কথাটা?'

'হ্যানস? পাগল হয়েছ তুমি! ওর পেটে বোমা মারলেও এ ব্যাপারে একটা শব্দও বের হবে না। নিশ্চিন্তে থাকতে পারো তুমি। এবার চলো, অনেক হয়েছে! একটু হাঁটাচলা করে আসা যাক্।'

মনের মেঘ খুব দ্রুত উড়ে যেতে লাগল রূপার। ভেবে দেখল রানা মিথ্যে বলেনি, ঘরটা তখন সত্যিই প্রায় অন্ধকার ছিল। তাছাড়া বাইরের জোরাল আলো থেকে অন্ধকার রূমে ঢুকেই কিছু দেখতে পাওয়া যায়ও না। 'আমাকে সময়মত উদ্ধার করার জন্যে অনেক ধন্যবাদ, রানা,' মৃদু গলায়, নতমুখে বলল ও। 'আমি কৃতজ্ঞ থাকলাম।'

'ব্যস, হয়েছে! সহকর্মীর বিপদে আরেক সহকর্মী সাহায্য করবে না তো কে করবে? এ জন্যে কৃতজ্ঞ থাকার কোন কারণ দেখি না আমি। এসো!'

হাফ-ট্রাক থেকে নেমে এল রূপা, রানার পাশাপাশি এগোল। 'কোথায়?'

'এই তো, কাছেই।' কিছুদূর যেতে দূর থেকে কমান্ডোদের কয়েকজনের ওপর চোখ পড়ল ওর। লোকগুলোকে খাবারের খোঁজে পাঠিয়েছিল হ্যানস। তিনটে ছাগল আর ডজনখানেক মুরগি নিয়ে ফিরে আসছে তারা। সব রোস্ট করা। 'যাক্, আজ আর উপোস করতে হবে না রাতে। হ্যানস!' হাঁক ছাড়ল ও। 'খেয়াল রেখো সবার ভাগে যেন সমান মাংস জোটে। নইলে তোমার পেছনদিকটা বারবিকিউ করে ঘাটতি পূরণ করব আমি।'

প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়ল দলের প্রত্যেকে। কিন্তু যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, প্রকাণ্ডদেহী জার্মানকে রক্তচোখে তাকাতে দেখে তেমনি হঠাৎ থেমে গেল লোকগুলো।

কিছুদূর গিয়ে এক সারি মাটির ঘর দেখতে পেল ওরা। আগন্তুক দেখেই সতর্ক হয়ে উঠল মায়েরা, খেলা থেকে যার যার সন্তানদের ডেকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকল। তাদেরকে অগ্রাহ্য করে ঘরের সামনে বসে থাকা এক বৃদ্ধের দিকে এগোল রানা। ভাবভঙ্গিতে তাকে গ্রামের সরদার বলেই মনে হলো।

কুঁড়ের ছায়ায় বসে অলস ভঙ্গিতে পাখির পালকের তৈরি একটা ঝাড়ন নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে সে। চেহারায় প্রচণ্ড বিরক্তি। কুতকুতে চোখে একবার রানাকে দেখছে, একবার রূপাকে। তার হাড্ডিসার সরু কাঁধ ও হাঁটু প্রায় সমবয়সী এক রংচটা লাল কম্বলে ঢাকা।

লোকটার সামনে পৌঁছে হাসল রানা, হাঁটু গেড়ে মুখোমুখি বসল। ততক্ষণে মেয়েরা পিছনে দাঁড়ানো রূপাকে প্রায় ছেঁকে ধরেছে। নিজেদের ভাষায় ওর অপরূপ চেহারার গুণকীর্তন করতে শুরু করে দিয়েছে। শিশুরাই বা আর ঘরে থাকবে কেন? মায়েদের দেখাদেখি তারাও এসে জড় হতে লাগল একে একে ভারী অস্বস্তিতে পড়ে গেল রূপা মেয়েদের কেউ হাসলে সৌজন্যের খাতিরে ও-ও হাসে, মাথা দোলালে ও-ও দোলায়। সবচেয়ে সমস্যায় পড়ল যুবতীদের কেউ কেউ ওকে ছুঁয়ে দেখতে শুরু করায়। সত্যি সত্যি ও মানুষ না আর কিছু, পরখ করছে। কোনরকমে ম্যানেজ করে নিল ও।

ওদিকে ভাঙা ভাঙা, জগাখিচুড়ি মার্কা আফ্রিকান বিদ্যা উজাড় করে বৃদ্ধের সাথে কথা বলতে শুরু করল রানা। তার সাথে চোখ ইশারা, অঙ্গভঙ্গি এবং হাত ও বাহুর ইঙ্গিতও চালিয়ে যাচ্ছে সমানে। তারপরও কয়েক মিনিট লাগল বুড়োকে মনের কথা বোঝাতে এবং তার বক্তব্য বুঝতে। যা জানার জেনে উঠে পড়ল ও লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে। এক প্যাকেট সিগারেট উপহার দিয়ে দ্রুত ফিরে চলল।

'কি জিজ্ঞেস করছিলে লোকটাকে?' প্রশ্ন করল রূপা।

'ধারেকাছে কোন এয়ারস্ট্রিপ আছে কি না।'

'ফলাফল?'

'আছে,' মাথা ঝাঁকাল ও 'বারোটসিল্যান্ডে। বুড়োর হিসেবে এখান থেকে হাঁটা পথে তিনদিনের দূরত্বে একটা ডার্চ মাইনিং ক্যাম্প আছে ওখানে। ক্যাম্পে এয়ারস্ট্রিপ আছে, একটা প্লেনও থাকে সব সময়।'

'বর্ডার গার্ড···?'

'আছে কিছু, কিন্তু ওদের নিয়ে চিন্তা নেই। ওরা কেবল পাতলা বীয়ার খায় আর পড়ে পড়ে ঘুমায়।'

ওরা যখন ক্যাম্প সাইটে পৌঁছল, হাফ-ট্রাকটা ততক্ষণে হ্যারল্ডের অভিজ্ঞ হাতের ছোঁয়ায় বেকার হয়ে গেছে পুরোপুরি। যে কয় গ্যালন ফুয়েল ছিল ওটার ট্যাঙ্কে, বের করে নিয়েছে সে। তারপর গুরুত্বপূর্ণ কিছু পার্টস ও তার-টার ছিঁড়ে-উপড়ে এমন অবস্থা করেছে যে খোদ নির্মাতা কোম্পানি ছাড়া আর কারও সাধ্য নেই ওটাকে কয়েকদিনের মধ্যে চালু করে। ফলে অন্য দুটো গাড়ির ওপর চাপ পড়ল।

সালাদিন আর্মার্ড কারের ধারণ ক্ষমতা চার, সেখানে উঠতে হলো আটজনকে। রানা ও রূপা বসল ড্রাইভারের সাথে গাদাগাদি করে, বাকি প্রায় সবাই বাদুড়ঝোলা হয়ে চলল। যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্রসহ অন্যরা উঠল ট্রাকে। হ্যানস থাকল ওটার নেতৃত্বে।

যাত্রা করার আগে সবাইকে নিজেদের গন্তব্য সম্পর্কে জানাল রানা। 'ওখানে যদি প্লেন পাওয়া যায়, তাহলে ওটা নিয়ে কাল দুপুরের আগেই সরে পড়তে পারব আমরা। কিন্তু যদি না পাওয়া যায়, সোজা পুবে যেতে হবে, বতসোয়ানার দিকে। যদি কোন কারণে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে সময় নষ্ট করা চলবে না। সোজা জাম্বিজি নদীর ভিক্টোরিয়া ফলস ক্রসিঙের দিকে চলে যাবে। যদি বাধা আসে, কি করতে হবে তোমরা জানো।

'এ দেশ থেকে একবার বেরিয়ে যেতে পারলে আর কোন চিন্তা নেই। রুশ মেজর আমার সঙ্গে যাচ্ছে। যদি কোন বড় ধরনের বাধা আসে কর্নেল টোগোর তরফ থেকে, তখন লোকটাকে প্রয়োজন হবে। কারও কোন প্রশ্ন আছে?'

নেই।

'তাড়াতাড়ি পেট পুরে খেয়ে নাও। এরপর আবার কখন খাওয়া জুটবে ঠিক নেই।'

এক ঘণ্টা পর যাত্রা করল দুই গাড়ির বহর। চাঁদের ঝলমলে রুপোলী আলোয় চারদিক হাসছে তখন।

ছয়

কর্নেল টোগো রেগে আগুন। রেডিওতে হেডকোয়ার্টার্সের সাথে যোগাযোগের অনেক চেষ্টা করেছে সে, কাজ হয়নি। হয়নি মানে, হয়েছে, ওখানকার অপারেটরের সাথে কথা হয়েছে। তাকে নির্দেশ যা দেয়ার দিতে পেরেছে, কিন্তু সে তা রিলে করার মত দায়িত্বপূর্ণ কোন অফিসারকে পাচ্ছে না। বারবার একই কথা বলছে লোকটা। ওখানে নাকি চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা চলছে, প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরপরই ব্যারাক ছেড়ে ভেগেছে সবাই।

এর অর্থ ওদিক থেকে নতুন কোন সাহায্য পাওয়ার উপায় নেই। এদিকে তার বাহিনীর এই বেহাল দশা, তবু এই নিয়েই তাকে ধাওয়া করতে হবে বিদেশী শয়তানের দলটাকে। যে করে হোক মেজর আলেক্সেইকে উদ্ধার করতে হবে ওদের হাত থেকে যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে শেষ হয়ে যাবে সে। ধ্বংস হয়ে যাবে সমূলে।

অথচ এদিকে খুব দ্রুত গড়িয়ে চলেছে সময়। এরমধ্যে একটা ট্রাক গর্তে পড়ে ফেঁসে গিয়েছিল, ওটাকে টেনে তুলতে পাক্কা একটা ঘণ্টা অপচয় হয়েছে তার। মেজরের সন্দেহ, এর ফলে অনেক পথ এগিয়ে গেছে শত্রু। সে নাগাল

পাওয়াঁর আগেই হয়তো বারোটসিল্যান্ডের বর্ডারে পৌঁছে যাবে। ওপারে পৌঁছে গেলে সে কি করবে গিয়ে?

যত দেবতা আছে, সবাইকে ধন্যবাদ যে ওদের একটা হাফ-ট্রাকে সমস্যা আছে। দ্রুত চলতে পারে না। টোগোর বিশ্বাস ওটার জন্যে প্রয়োজনীয় গতি তুলতে পারবে না ওরা। এখন পর্যন্ত সেই ভরসাতেই আছে সে। পিছনে ফেলে আসা প্রতিটা গ্রামে থেমে দলটার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়েছে কর্নেল, বুঝতে পারছে দু'দলের ব্যবধান দ্রুত কমে আসছে। যদিও এইসব অশিক্ষিত পশুর দল সময় সম্পর্কে কোন ধারণা দিতে পারেনি, তবে সে যে ওদের তুলনায় দ্রুত এগোচ্ছে, তা জানাতে দ্বিধা করেনি।

কিন্তু এই গতি কি যথেষ্ট? পরিত্যক্ত হাফ-ট্রাকটা দেখতে পেয়ে নতুন করে হিসেব কষতে শুরু করল সে। নিশ্চিত হলো শত্রু বারোটসিল্যান্ডের দিকেই গেছে। ঠিক আছে, দেখা যাক ধরা যায় কি না।

প্রায় সমতল সারফেস ধরে যথাসম্ভব দ্রুত ছুটছে সালাদিন ও ট্রাক, একের পর এক ঘুমন্ত গ্রাম পাশ কাটিয়ে। সালাদিনের দু'পাশে ও পিছনে বাদুড়ঝোলা হয়ে রয়েছে বেশিরভাগ কমান্ডো, খানিক পরপর পালাবদল করাতে হচ্ছে তাদের। রানা নিজেও ঝুলছে তাদের সাথে। কেবল রূপা ও রুশ মেজরকে কাজটা করতে হচ্ছে না।

ওদিকে আড়াই টনী ট্রাকের ক্যারিয়ারের মেঝেতে স্তূপ হয়ে আছে সমস্ত হেভি ও লাইট আর্মস-অ্যামিউনিশন। কমান্ডোদের কিছু দু'পাশের বেঞ্চে, কিছু স্তূপের ওপর বসে ঝিমিয়েছে। আর যাই হোক, সালাদিনের ঝুলন্ত যাত্রীদের মত পড়ে যাওয়ার ভয় অন্তত তাদের ছিল না। কিন্তু তাই বলে খুব একটা স্বস্তিতেও ছিল না। মাথার সাথে মাথার ঠুকে যাওয়া, নিচ থেকে ধাতব জিনিসগুলোর বেমক্কা খোঁচা আর হায়েনার কর্কশ ডাকাডাকিতে প্রায় সারাক্ষণই সতর্ক, ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছে।

চাঁদের আলোয় পথে প্রচুর উই ঢিপি চোখে পড়েছে রানার। তার কিছু কিছু অনেক উঁচু ও পুরানো। কোন কোন আফ্রিকান দেশের স্বাধীনতার চেয়েও পুরানো। হেডলাইটের আলোয় ট্র্যাক খুঁজে বের করে চলতে হয়েছে ওদের, তাই অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট নয় রানা। তবু থেমে থাকতে হয়নি, বা পথের খোঁজে এদিক সেদিক করতে হয়নি, তাতেই ও খুশি।

যদি বর্ষাকাল হত, তাহলেই হয়েছিল। কাদার সাগরে পরিণত হত এই প্রান্তর, গভীর খ্রেডের হেভিডিউটি টায়ার ছাড়া এক ইঞ্চিও এগোনো যেত না। আধুনিক জীবন যাপনে অভ্যস্তদের জন্যে নয় এ অঞ্চল, সম্পূর্ণ আলাদা। অথচ প্রকৃতির সমস্ত অমূল্য সম্পদ রয়েছে এই মাটির নিচেই। সেসব উদ্ধার করতে কত পাশ্চাত্য খননকারী যে জীবন দিয়েছে এই মাটিতে, তার কোন হিসেব আধুনিক বিশ্ব জানে না।

ঢুলুঢুলু চোখে সামনে তাকিয়ে আছে ও, টারেটে বসে হেডলাইটের আলোয়

সামনে দেখার চেষ্টা করছে। চোখের ভিতরটা ধুলোবালি ঢুকে খরখর করছে, ঘুমের অভাবে জ্বালা করছে চোখ। একটু পরপর পিছনে তাকাচ্ছে কোন আলো চোখে পড়ে কিনা দেখতে। না, নেই।

ভোরের আলো ফোটার ঘণ্টাখানেক আগে একটা নিচু রিজে উঠল সালাদিন। সামনে তাকাল ও, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে নেচে উঠল বুক। আলো! যদিও খুব ক্ষীণ এবং অনেক দূরে রয়েছে, তবু ওটা কিসের বুঝতে কোন সমস্যা হলো না বারোটসিল্যান্ড! হেডলাইট অফ করার নির্দেশ দিল রানা। পুবদিকে গাড়ি ঘোরাতে বলল সামনে কিছু কুঁড়েঘর ও একটা লম্বাটে কাঠের ঘর দেখে। ওটা বর্ডার পোস্ট, এড়িয়ে যেতে হবে।

গার্ডদের চোখে পড়ার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হলো না ওর। বুড়ো সরদারের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে এখন ঘুমাচ্ছে ব্যাটারা। তারপরও যদি দেখেই ফেলে কেউ, স্রেফ উপেক্ষা করবে ঠিক করল রানা। আফ্রিকানরাও ওই কাজ করে থাকে মাঝেমধ্যে। যদি মনে করে ওদিকে তাকানো উচিত নয়, তাতে সমস্যা হতে পারে, তাহলে তাকায় না।

ওদিকে, ওদের অনেক পিছনে, চোখ থেকে বিনকিউলার নামাল কর্নেল টোগো রানার আধঘণ্টা আগে থেকেই নিজ বহরের হেডলাইট অফ করে এগোচ্ছে সে।

দূর থেকে ওদের আড়াই টনীর টেইল লাইট দেখতে পেল লোকটা। ট্র্যাক ছেড়ে সরে যাচ্ছে একদিকে। হাসি ফুটল তার মুখে। আর বেশি অপেক্ষা করতে হবে না, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ব্যাটাদের পাকড়াও করবে সে।

বর্ডার অতিক্রম করে আরও তিন-চার মাইল গিয়ে আলো জ্বালার নির্দেশ দিল রানা। চাঁদ ডুবে গেছে অনেক আগেই। টোগো যাতে ট্রেইলের হদিস সহজে না পায়, সে জন্যে ঝোপঝাড়ের ওপর দিয়ে চলল কিছুক্ষণ। তারপর একেবারে আচমকা ব্রেক কষল সালাদিন, আরেকটু হলে একটা তাঁবুর ওপর চড়ে বসত ট্রাকও কড়া ব্রেক কষল

তাঁবুর ভেতর থেকে ব্রাশ ফায়ারের মত একটানা গালাগালি ভেসে এল। এমন জঘন্য সব গাল যে হ্যানস ল্যাংসডর্ফও তৎক্ষণাৎ মনে মনে ওস্তাদ মেনে নিল লোকটাকে। খিস্তি চালু রেখেই তাঁবুর ফ্ল্যাপ সরিয়ে বেরিয়ে এল এক বৃদ্ধ, মারমুখো হয়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে আর এগোল না।

সালাদিনের টারেটে রানাকে অবিচল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে প্রথমে, পরে দেখল তার বুক সই করে একটা অটোম্যাটিক ধরা আছে ওর হাতে পলকে চেহারা সমান হয়ে গেল বৃদ্ধের, খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিজেকে জন গ্রাইমস, একজন হতভাগ্য প্রসপেক্টর বলে পরিচয় দিল।

'ওয়েল, দেন,' রানাকে নয়, মনে হলো ওর অটোম্যাটিকের উদ্দেশে বলল সে 'আমার মনে হয়, যা খুশি করার অধিকার আছে আপনাদের।'

টারেটের ওপর উঠে পড়ল রানা, ফেন্ডার হয়ে লাফিয়ে নেমে দাঁড়াল খাকি প্যান্ট ও বুশ হ্যাট পরা বৃদ্ধের সামনে। গ্রিজলি বেয়ারের মত স্বাস্থ্য লোকটার, ভুঁড়িটা প্রকাণ্ড। ওকে নেমে আসতে দেখে ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল তার।

'ভয় নেই,' বলল ও। 'আমরা আপনার ক্ষতি করতে আসিনি।'

'আমি বুঝতে পারছি আপনারা কারা,' বৃদ্ধ বলল। 'আমার রেডিও আছে। সময় পেলে খবর-টবর শুনি। ব্লাডি ম্যানিয়াকটা কাল মরেছে জানি আমি।' রানাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলেই চলল সে। 'ওয়েল, দেন, গোটা বিষয়টাকে এখন অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করছি আমি। ওয়েলকাম। যদি কিছু প্রয়োজন হয়, জন গ্রাইমসকে বলতে প্যারেন। ক্ষমতা থাকলে সে আপনাদের ফিরিয়ে দেবে না। বাই দ্য ওয়ে, বন্ধুরা আমাকে গ্রিমি বলে ডাকে।'

ট্রাক থেকে হ্যানস ও সুমন্তকে নেমে আসতে দেখে রানা বলল, 'ভেতরের সবাইকে বেরিয়ে আসতে বলো। হাত-পা ছড়িয়ে একটু জিরিয়ে নিক। আলেক্সেইর ওপর নজর রাখতে বলো একজনকে। আমি এঁর সাথে একটু কথা বলব।'

রূপাকে এসে রানার সাথে যোগ দিতে দেখে বিস্মিত হলো গ্রাইমস। হ্যাট তুলে সম্মান দেখাল। 'ওয়েলকাম, মাই ফেয়ার লেডি! একদল কাটখোট্টা অস্ত্রধারীর সাথে এরকম কাউকে আশা করিনি আমি।'

গাড়ি থেকে নেমে আসতে থাকা ক্যামোফ্লেজ ফেটিগ পরা কাঠামোগুলো দেখল সে কৌতূহলের চোখে। রানার দিকে ফিরল। 'কিন্তু আপনারা এদিকে কেন? এক সময় আর্মিতে ছিলাম আমিও। সেকেন্ড গ্রেট ওঅরে লিবিয়ায় যুদ্ধ করেছি,' বলে ইঙ্গিতে নিজের তাঁবু দেখাল। ব্রিটিশ এইটথ আর্মির পুরানো, রংচটা ফিল্ড টেন্ট ওটা। 'আপনাদের লাইন অভ ওঅর্ক তো ঠিক মনে হচ্ছে না আমার। গোলমাল হয়েছে কোথাও মনে হচ্ছে।'

মানুষটা দেখতে যা-ই হোক, ওপরের চেম্বারটা ভালই কাজ করে, ভাবল রানা। মাথা নাড়ল। 'একটু একটু।' ম্যাপটা বের করল ও। টেন্টের ভেতরে ঝুলিয়ে রাখা নিভু নিভু কেরোসিনের বাতিটা আনিয়ে আলোর সামনে মেলে ধরল। টোকা দিল ম্যাপের এক জায়গায়। 'আমরা এখন এখানে, তাই না?'

শার্টের পকেট থেকে বাইফোকাল বের করে চোখে লাগাল প্রসপেক্টর। জায়গাটা দেখে নিয়ে মাথা দোলাল। 'অনেকটা। কিন্তু এখান থেকে যাবেন কোনদিকে? জিম্বাবুইয়ে? তা হলে বলব ভুল পথে যাচ্ছেন আপনারা। মরুভূমি ছাড়া কিছু নেই দক্ষিণে। আর যদি জাম্বিজি পাড়ি দিয়ে বতসোয়ানা হয়ে আরও দক্ষিণে যেতে চান, তাহলে দুনিয়ার আরেক মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত ওকাভাঙ্গো সোয়াম্পল্যান্ড ছাড়া কিছুই পাবেন না। তার ওপাশে আছে গজবপড়া কালাহারি মরুভূমি। তাছাড়া পথে স্থানীয় ব্লাডি কাফিরদের কোনরকম সহানুভূতি পাবেন না। এরা লণ্ডম্বাকে পছন্দ করত না ঠিকই, কিন্তু বিদেশী অস্ত্রধারীদেরকেও খাতির করবে না।'

'আমি জানতে চাইছিলাম,' শান্ত গলায় বলল ও। 'ধারেকাছে কোন ডাচ

মাইনিং ক্যাম্প আছে, যেখানে এয়ারস্ট্রিপ আছে?'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল লোকটার। 'বুঝেছি। ওদের প্লেন নিয়ে কেটে পড়তে চাইছেন। ভাল, ভাল, খুব ভাল। উচিত শিক্ষা হবে ব্যাটাদের। খুব বাজে স্বভাব ওদের। আমার খোঁড়া জায়গা থেকে কয়েকবার ভাগিয়ে দিয়েছে আমাকে।'

'আছে কি না বলুন,' কিছুটা অধৈর্য শোনাল ওর গলা। 'আমাদের হাতে সময় কম।'

'অল রাইট, অল রাইট! হ্যাঁ, আছে। একটা ডাকোটা প্রায় সময়ই মজুত থাকে সেখানে। অবশ্য ওটাকে দখল করা সহজ না-ও হতে পারে। তবে মনে হয় আপনারা পারবেন। এই যে সেই স্ট্রিপ।'

ম্যাপের এক জায়গায় তর্জনী রাখল বৃদ্ধ। 'এখানে। কাসেমপার কাছে. এই দেখুন। এখনই যাত্রা শুরু করলে ওখানে পৌছতে ঘণ্টাখানেক লাগবে। প্রথমে পশ্চিমে যাবেন পাঁচ মাইল। ওখানে পাবেন ডাচদের তৈরি পাকা রাস্তা। ওই রাস্তা ধরে দক্ষিণে দশ মাইল গেলেই স্ট্রিপ। একটা নিচু পাহাড় দেখবেন পথে, ওটার ওপর কয়েকটা বড় উই ঢিপি আছে। ওই পাহাড়ের ওপাশে গিয়েই দক্ষিণে ঘুরে যেতে হবে। তাহলে পাকা রাস্তা মিস হওয়ার কোন চান্স নেই।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। হ্যানসের দিকে ফিরল। 'গাড়িতে উঠতে বলো সবাইকে।' উঠে পড়ল ম্যাপ ভাঁজ করে। 'গ্রিমি, আপনার জন্যে কিছু করতে পারি আমরা?'

মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। 'না, ধন্যবাদ। আমার যা যা প্রয়োজন, সবই মজুত আছে এখানে। আপনারা বর্বর দানবটাকে খতম করতে পেরেছেন, তাতেই আমি খুশি। এই মৃত্যু লোকটার আরও অনেক আগেই পাওনা হয়েছিল।'

তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলো ওরা। একদম সঠিক পথনির্দেশই দিয়েছে মানুষটা. ঠিক পাঁচ মাইল পশ্চিমে পাওয়া গেল সেই পাহাড়, তারপর পাকা রাস্তা। পুবের আকাশ একটু একটু ফরসা হয়ে উঠতে দেখে হেডলাইট অফ করে এগোল সালাদিন ও ট্রাক। স্ট্রিপে প্লেন আছে কি নেই ভেবে শেষের দিকের কয়েকটা মিনিট প্রচণ্ড উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটল ওদের সবার।

ওদের ট্র্যাক খুঁজে এগোতে কোন সমস্যাই হলো না কর্নেলের। কমান্ডো বাহিনী যাত্রা করার আধ ঘণ্টার মধ্যে জন গ্রাইমসের টেন্টের কাছে পৌছল সে। মাটিতে সালাদিন ও ট্রাকের ছাপ দেখে বুঝে নিল শত্রু থেমেছিল এখানে। এবং তার হিসেবে এই বিরতির কারণ একটাই হতে পারে, কিছু জানতে এসেছিল ওরা।

বুড়ো প্রসপেক্টরকে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে চোখ কুঁচকে উঠল টোগোর। কি জানতে চাইছিল ওরা তোমার কাছে, বুড়ো ভাম? ভাবল সে।

তথ্যটা আদায় করতে মূল্যবান ত্রিশটা মিনিট ব্যয় হয়ে গেল। ব্যাপারটা পছন্দ হলো না কর্নেলের

বৃদ্ধের নিথর দেহ পড়ে থাকল মাটিতে, চোখ খোলা। তার উরুর ওপর দিয়ে গড়িয়ে দেয়া হলো ল্যান্ড-রোভার। সরকারী বাহিনী দুশো গজ যাওয়ার আগেই

ভোরের মৃদু বাতাসে ভেসে বেড়ানো তাজা রক্তের গন্ধে শেয়াল ও হায়েনার দল এসে হাজির হলো সেখানে।

ডাচ মাইনারদের তৈরি রাস্তাটা ভালই। মোটামুটি চওড়া ও মসৃণ। মাঝেমধ্যে খানাখন্দ আছে অবশ্য, তারপরও মন্দ মনে হলো না রানার। ওটা ধরে দশ মাইল এগোতে ক্যাম্পের সাইনপোস্ট চোখে পড়ল। ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, ডাচ ও স্থানীয় ভাষায় সবাইকে ট্রেসপাসিঙের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে ওটার মাধ্যমে।

সালাদিনের টারেটে দাঁড়িয়ে সামনে তাকিয়ে আছে ধুলোয় মোড়া মাসুদ রানা। চোখের প্রতিটা পাপড়িতে পর্যন্ত ধুলো জমে আছে। দূরে টিনের চালে সূর্যের আলো চিক্‌চিক্ করতে দেখে ভাল করে তাকাল। হ্যাঁ, ওটাই! আরেকটু এগোতে প্লেনটাও চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁত দেখা দিল ওর।

ডাচরা বাধা দিলে কি ভাবে ঠেকাবে, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে দিল। বাধা এলেও তা খুব কড়া কিছু হবে না বলেই ওর ধারণা। অন্তত খুনোখুনি পর্যন্ত গড়াবে না। রানাও সেটাই চাইছে। অনেক হয়েছে, আর রক্ত দেখতে চায় না।

পিছনে তাকাতেই বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল ওর আসছে কর্নেল টোগো! প্রায় আকাশছোঁয়া ধুলোর মেঘের আগে আগে ছুটছে তার ল্যান্ড-রোভার, দূর থেকে ম্যাচ বাক্সের মত লাগছে ওটাকে। প্রমাদ গুণল ও ব্যাটা যে গতিতে আসছে, তাতে সময় বেশি পাওয়া যাবে না। এখন প্লেনে যদি ফুয়েল ভরতে হয়, তাহলেই হয়েছে।

ওদিকে কর্নেলের খুশি আর ধরে না খালি চোখেই শত্রুদের দেখতে পাচ্ছে ও এখন। সমস্ত দেবতার উদ্দেশে আবেদন জানাতে লাগল সে যাতে দলের নেতাটাকে জ্যান্ত পাকড়াও করতে পারে। কেননা তার জন্যে বিশেষ এক মৃত্যুর আয়োজন করবে ও। এমন মৃত্যু, যার কথা কেউ কখনও কল্পনাও করেনি। জানালা দিয়ে মুখ বের করে চেঁচিয়ে একের পর এক নির্দেশ দিতে শুরু করল সে পিছনের গাড়িগুলোর কমান্ডারদের উদ্দেশে।

চোখ কুঁচকে শূন্য দৃষ্টিতে অফিসরুমের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে মেজর ফরবস্। একটু আগে অস্বস্তিকর একটা রিপোর্ট রিসিভ করেছে সে। কিমশাকার রাজধানী কিমশাকা সিটি থেকে তার ইনফর্মার পাঠিয়েছে।

খবরটা হলো, যে রাতে লগুম্বাকে খতম করা হয়, সেদিনই সেনাপতি কর্নেল টোগোর সাথে এক রুশ মেজরকে ফুল ইউনিফর্মড অবস্থায় দেখা গেছে রাজধানীর বাইরে এবং সেই রাতেই রাজধানীর বাইরে বড় ধরনের সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটেছে অজ্ঞাত দুই পক্ষের মধ্যে। ওর পর থেকে টোগো, রুশ মেজর ও মাসুদ রানার গোটা বাহিনী নিখোঁজ।

কি চলছে ওখানে? ওই রুশ মেজরের উপস্থিতির সাথে মেজর রানা ও তার বাহিনীর উধাও হয়ে যাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই তো? না হয় থাকলই, তাই বলে

ত্রিশ জনের গোটা একটা কমান্ডো বাহিনী স্রেফ উধাও হয়ে যাবে, তাই বা কেমন কথা?

সাত

স্ট্রিপের দক্ষিণ প্রান্তে, হ্যাঙ্গার ও ওয়ার্কশপের সামনের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে প্লেনটা—একটা পুরনো ডাকোটা।

ওদিকে উল্টোদিকে, উত্তর প্রান্তে এসে দাঁড়াল ওদের সালাদিন আর্মার্ড কার ও ট্রাক। ৫৭ এমএম রিকয়েললেস ও চারজন সঙ্গী নিয়ে ট্রাক থেকে বেইলআউট করল হ্যানস ল্যাংসডর্ফ। সুমন্ত ও হ্যারিসন মর্টার নিয়ে নেমে গেল ওদের সাথে। রুশ মেজরকে ট্রাকে তুলে দিয়েছে রানা, এমুহূর্তে ওর সাথে আছে সালাদিনের ড্রাইভার, একজন লোডার এবং একজন গানার। আর রূপা। অন্য কমান্ডোরা ট্রাকের কাছে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় আছে।

টারেট থেকে সরকারী বাহিনীর অগ্রযাত্রা দেখে দ্রুত হিসেব কষে ফেলল রানা। কাছে এসে ওদেরকে ঘিরে ফেলবে কর্নেল টোগো, ভাবছে ও। সেটাই স্বাভাবিক। কিছু বড় ঝোপ ও গাছ ছাড়া স্ট্রিপের চারদিকে আড়াল নেয়ার মত কিছু নেই, তাও দশ ফুটের উঁচু নয় কোনটা। কাজেই বেশি কাছে চলে আসার আগেই ব্যাটাকে আটকে দেয়া ছাড়া উপায় নেই ওদের।

'হ্যানস, এবারের ব্যাপারটা বেশ কঠিন হবে। ব্যাটাদের সমস্ত অ্যাপ্রোচ ঠেকানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না, তাই ওদেরকে কাছে টেনে আনতে হবে। তুমি এগিয়ে যাও, প্রথম যে গাড়ি নাগালে আসবে, উড়িয়ে দেবে। তোমার কাজ শেষ হলে আমি সালাদিন নিয়ে ওদের বাঁ দিকে গিয়ে টোয়েন্টি এমএম ওপেন করব। খেয়াল রেখো, আমাদের ওপর শেলিং করে বোসো না আবার। সুমন্ত-হ্যারিসন প্লেন দখল না করা পর্যন্ত ওদেরকে ব্যস্ত রাখতে হবে আমাদের। কাজেই চোখ খোলা রাখবে। গট দ্যাট?'

হেসে স্যালুট করল জার্মান কমান্ডো। 'জা, মিয়েন ক্যাপিটান।' চার সঙ্গীকে নিয়ে দ্রুত ওদের কাছ থেকে সরে গেল সে।

বাকি দু'জনের দিকে ফিরল এবার রানা। 'সুমন্ত, হ্যারিসন, শুরু করে দাও। তোমরা জানো কিভাবে কি করতে হবে। রূপা, তুমিও যাও ওদের সাথে।' ওর মধ্যে একটু ইতস্তত ভাব দেখে পরক্ষণে কঠোর গলায় বলল, 'আউট, রূপা।'

সবই বুঝল ও, কিন্তু এরকম মুহূর্তে রানাকে ছেড়ে যেতে মন চাইল না। তবু এক পা কার থেকে বের করে ওর দিকে তাকাল। মৃদু গলায় বলল, 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম সঙ্গে থেকে।'

'থ্যাঙ্কস!' রানা নির্বিকার। 'এ মুহূর্তে তেমন কিছু করার নেই তোমার।' একটা জি-থ্রী রাইফেল ওর হাতে তুলে দিল। 'এটা সাথে রাখো। দরকার হতে পারে।'

ওরা ট্রাকে ওঠার আগেই ঘুরে গেল সালাদিন, দূরের বড় একটা ঝোপের দিকে ছুটল। ভেতরে বসে ২০ এমএম লোড করল গানার। ডাকোটার এঞ্জিনের আওয়াজ না শোনা পর্যন্ত টোগোকে ঠেকিয়ে রাখবে ওরা, তারপর ভাগবে জানপ্রাণ নিয়ে

ওদিকে হঠাৎ করে খোলা স্ট্রিপে উঠে পড়ল কমান্ডোবাহী ট্রাক, হাঁ-হাঁ করে ছুটে গিয়ে একদম ডাকোটার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। ভেতর থেকে ঝুপ্-ঝাপ করে নেমে পড়ল সবাই, চোখের পলকে ডিমের আকৃতি নিয়ে ঘিরে ফেলল ওটাকে। প্রাণ বাঁচানোর এই একটাই উপায় আছে, কাজেই এখন অন্য কাউকেই এর ধারেকাছে ঘেঁষতে দেবে না।

চারজন ছিল হ্যাঙ্গারে। একজন সাদা, তিনজন কালো। গাড়ি, ব্রেক, ভারী বুট, ইত্যাদির শব্দে কৌতূহলী হয়ে কি হচ্ছে দেখার জন্যে বেরিয়ে আসতে উদ্যত হলো তারা, কয়েক পা এগিয়েও জায়গায় জমে গেল সুমন্ত, হ্যারিসন ও আরও দু'তিনজনকে দেখে। মুখ খোলার সাহস হলো না কারও, কারণ এরা একেবারেই অন্য জাতের মানুষ।

তাদের দিকে এগোল সুমন্ত, হ্যাঙ্গারের এক মাথায় পর্দাঘেরা টুলস্ রাখার লোহার খাঁচা দেখাল হাত তুলে। 'ইনসাইড! নো টক, নো কোয়েশ্চেনস! তোমাদের কারও ক্ষতি করতে চাই না আমরা, কেবল প্লেনটা চাই

কোন প্রতিবাদ উঠল না মানুষগুলোর তরফ থেকে। ভয় এক-আধটু যদি পেয়েও থাকে, চেহারা দেখে বোঝা গেল না। তাদেরকে খাঁচায় ভরে দিল সুমন্ত চোরের হাত থেকে যন্ত্রপাতি নিরাপদ রাখতে তৈরি করা হয়েছে ওটা, দরজায় তালা মারার ব্যবস্থা আছে। ওটা তুলে নিয়ে সঙ্গীদের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল সুমন্ত, 'পুরো ক্যাম্প চেক্ করে দেখো! আর কাউকে পেলে নিয়ে এসো এখানে।'

দ্রুত সম্পন্ন করা হলো সার্চ। কেউ নেই আর। তালা লাগিয়ে দিয়ে হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে এল ওরা। আগেই প্লেনে উঠে পড়েছে হ্যারিসন, ককপিটে এঞ্জিন চেক করতে ব্যস্ত এ-মুহূর্তে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে সুমন্তর উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল সে, 'ফুয়েল লাগবে!' হ্যাঙ্গারের কাছের একটা ম্যানুয়াল পাম্প ও কয়েকটা পঞ্চান্ন গ্যালনী ব্যারেল দেখাল সুমন্ত। 'চেক্ করো ওগুলো। যা পাওয়া যায় উইং ট্যাঙ্কে পাম্প করাও এখুনি।'

পাঁচজনকে ব্যারেল চেক্ করার এবং আরেকজনকে উইঙের ওপর উঠে ট্যাঙ্কের ক্যাপ খোলার কাজে লাগিয়ে দিয়ে ককপিটের উদ্দেশে পাল্টা হাঁক ছাড়ল, 'কতক্ষণ লাগবে তোমার?'

'যতক্ষণ না সাফিশিয়েন্ট তেল ভরতে পারছ!'

'হ্যাঙ্গারে ওদের মধ্যে একজন মেকানিক আছে। তাকে কাজে লাগাতে পারো।'

জানালা থেকে মুখ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল পাইলটের, সঙ্গে সঙ্গে আবার দেখা দিল। 'হোলি শিট! কথাটা আমার মাথায় এলো না কেন? দাঁড়াও, আসছি আমি।'

একটু পর নিয়ে আসা হলো লোকটাকে। সাদা চামড়ার যে, ডাচ। নাম জান

রেইকস্। কয়েক মিনিট তার সাথে কথা বলল হ্যারিসন, তারপর হতাশ ভঙ্গিতে শ্রাগ করল সুমন্তর দিকে ফিরে। 'ব্যাটা সত্যি বলছে কি না বুঝব কি করে?'

হাসি ফুটল সুমন্তর মুখে। 'বোঝার দরকারটা কি? ওকে বলো, আমাদের সাথে ও-ও যাচ্ছে। তাহলে আর চিন্তা থাকবে না।'

'গুড আইডিয়া!' লোকটার দিকে ফিরল সে। 'কি বুঝলে, তেলতেলে ডাচ? তুমিও যাচ্ছ আমাদের সাথে। যদি প্লেনে কোন গণ্ডগোল থাকে, আমাদের সাথে তুমিও মরবে।'

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠল লোকটার। দাঁত দিয়ে দশ বছর ধরে গ্রীজের আন্ডারকোটিং জমে স্তর পড়ে থাকা নখ খুঁটল কিছুক্ষণ। 'সেক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যাপার জানিয়ে রাখা দরকার,' নিচু গলায় বলল সে। 'প্লেনটার সিগন্যাল লাইট হাইড্রলিকসের ওপরে আছে। আর ল্যান্ডিং গীয়ারের লাইন খোলা। জোড়া দিয়ে নিতে হবে।'

'অমায়িক ছেলে!' তার পিঠ চাপড়ে দিল হ্যারিসন। 'যাও, সমস্যার সমাধান করে ফেলো। কারণ সত্যি-মিথ্যে যা-ই বলে থাকো, তারপরও তোমাকে যেতেই হচ্ছে। তবে তাড়াতাড়ি কাজ সারবে, হাতে সময় নেই মোটেই। একদল জংলী তাড়া করে আসছে আমাদেরকে ধরার জন্যে। ধরতে পারলে শিক-কাবাব বানাবে সবাইকে। তুমি যে আমাদের দলের নও, ওরা তা জানে না কিন্তু।'

ঢোক গিলল রেইকস্। 'পাঁচ মিনিট লাগবে আমার!' বলেই একদৌড়ে খাঁচায় গিয়ে ঢুকল, টূলস্ চেস্ট আর একটা পাঁচ গ্যালনী হাইড্রলিক ফ্লুইডের ক্যান নিয়ে প্রায় তখনই বেরিয়ে এসে ডাকোটার দিকে ছুটল।

নিরাপদ অবস্থান থেকে ল্যান্ড-রোভার নিয়ে সামনে চলে এল টোগো। ফিল্ড গ্লাস চোখে লাগিয়ে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল। একলাফে প্লেনটার কাছে চলে এল। ওটার চারদিকে, এবং উইঙের ওপর মানুষ দেখতে পেল সে। ট্রাকটাও দেখতে পেল, কিন্তু আর্মার্ড কারটা কোথায়?

সংঘর্ষ আর ইস্পাত ছেঁড়াখোঁড়ার বিকট শব্দে ঘুরে তাকাল সে, দেখতে পেল শূন্যে উড়ছে ইস্পাতের টুকরো, পানি আর ধোঁয়া। রানার ২০ এমএমের ব্রাশ ফায়ারে নাক উড়ে গেছে তার একটা ট্রাকের, আগুন ধরে গেছে মুহূর্তে। কিন্তু সৈন্যরা কেউ হতাহত হয়নি, দ্রুত নেমে পড়েছে তারা। ১০৬ রিকয়েললেস রাইফেলটা আছে তাদের সাথে।

চেঁচিয়ে কিছু নির্দেশ দিল রানা, তৎক্ষণাৎ ঝোপের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল সালাদিন। একরাশ বুলেট ছুঁড়ে দ্রুত আরেক ঝোপের আড়ালে চলে গেল। বারবার একই কাজ করতে লাগল ওটা, খোলা জায়গায় আসামাত্র গানার তার মেশিনগানের ট্রিগার টেনে ধরে রাখে। এভাবে চলল কিছু সময়, এরমধ্যে টোগোর বাকি গাড়িগুলোর ক্ষতি হলো প্রচুর, যদিও সৈন্যরা অক্ষতই থাকল প্রত্যেকে।

গুলির তোড় একটু কমে আসতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল তারা, এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে লোড করে ফেলল ১০৬ এমএম। কাজটা শেষ হতেই বেশ কাছের

অন্য এক ঝোপের আড়াল থেকে আচমকা উদয় হলো সালাদিন ওটার ২০ এমএমের গুলি খেয়ে তিনজন সৈন্য পড়ে গেল, প্রায় একই সঙ্গে সালাদিনও বিস্ফোরিত হলো ১০৬ এমএমের শেলের ঘায়ে।

সরাসরি সামনের বাম টায়ারে আঘাত করল শেল। প্রচণ্ড এক ঝাঁকির সাথে ফেন্ডার উড়ে গেল ওটার, শেলের উত্তপ্ত স্প্লিন্টার ধাতব দেহ ফুটো করে ভেতরে ঢুকে এ-দেয়াল সে-দেয়াল করে বেড়াল গতি না হারানো পর্যন্ত। উল্টে পড়তে শুরু করল আর্মার্ড কার, বিপদ বুঝে রানা আগেই লাফিয়ে পড়তে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারল না। সালাদিন কাত হয়ে পড়ার ঝাঁকিতে অবশ্য বেরিয়ে পড়ল, পনেরো ফুট উড়ে গিয়ে পিঠ দিয়ে আছড়ে পড়ে হতবিহ্বল হয়ে গেল। একই মুহূর্তে বার্স্ট করল ওটার ফুয়েল ট্যাঙ্ক সঙ্গীদের মরণ চিৎকার শুনল রানা, ভেতরে মজুত অ্যামিউনিশন বিস্ফোরণের শব্দের তলায় চাপা পড়ে গেল তা শুরু না হতেই।

দূর থেকে রানাকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কর্নেল, 'ওকে ধরো! জ্যান্ত ধরে নিয়ে এসো আমার কাছে! প্লেন উড়িয়ে দাও! প্লেন উড়িয়ে দাও!'

নির্দেশ পেয়ে তিনজন সৈন্য ছুটে আসতে লাগল রানার দিকে, ওদিকে ১০৬ এমএমের ক্রুরা দীর্ঘ টিউবটা প্লেনের দিকে তাক্ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। আর্মার্ডের ধাক্কা তখনও সামলে উঠতে পারেনি রানা, মাথা ঘুরছে। কোমরের ওপরের অংশ ঝুঁকিয়ে আড়ালে আড়ালে এগিয়ে আসছে লোকগুলো, গুলি করার জন্যে কোমরের কাছে অটোম্যাটিক প্রস্তুত। ওদের দেখতে পেয়ে আঁতকে উঠে পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার দরকার হলো না।

চাপা হুশ্শ্ শব্দ উঠল একটা, পরক্ষণে তাদের তিনজনেরই দেহ টুকরো টুকরো হয়ে গেল। একই মুহূর্তে রানার বাঁদিকের এক ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল হ্যানস ল্যাংসডর্ফ। ৫৭ এমএম নিয়ে আরও কয়েকজন রয়েছে পিছনে। 'ওটাকে শেষ করো!' অদূরে টোগোর ১০৬ এমএম দেখিয়ে চিৎকার করছে সে, 'হিট্ করো, নইলে প্লেন ধ্বংস করে দেবে ওরা!'

তখনও কিছুটা বেসামাল রানার দিকে হাত বাড়াল সে, বাহু ধরে হ্যাঁচকা টানে তুলে ফেলল। 'দৌড় দাও, রানা! আমি আসছি!'

৫৭ এমএম থেকে এক রাউন্ড শেল ছোঁড়া হলো, কিন্তু মিস হলো ওটা। তবে স্বয়ং কর্নেলের এত কাছ দিয়ে গেল যে ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল তার। শুয়ে পড়ে মাটিতে মুখ গুঁজতে গিয়ে খানিকটা মাটি খেয়েই ফেলল।

ওদিকে এয়ারস্ট্রিপে শত্রু প্রতিহত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে অবশিষ্ট কমান্ডোরা, তেলের খালি ড্রাম দিয়ে আড়াল তৈরি করছে ব্যস্ত হয়ে। ওদিকে মেকানিক জ্যান রেইকস্ হাত চালাচ্ছে ঝড়ের বেগে, তার ক্রুরাও মহাব্যস্ত। হ্যারিসনের চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করা অকথ্য গালাগালি নীরবে হজম করে তেল ভরছে ডাকোটার উইং ট্যাঙ্কে।

ল্যান্ডিং গীয়ারের সাথে হাইড্রলিক লাইন জুড়ে দিয়ে ফ্লুইড ঢেলে রিজার্ভয়ের

ভরে ফেলল মেকানিক। কোথাও লীক করছে কি না দেখে নিয়ে শূন্য ক্যান ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল। 'দ্যাট'স ইট! হয়ে গেছে!'

উইং ট্যাঙ্কের ফুয়েল গজ চেক করে জানালা দিয়ে মুখ বের করে চেঁচিয়ে উঠল পাইলট, 'ক্যাপ লাগিয়ে দাও!' সুমন্তর উদ্দেশে হাত নাড়ল। 'উঠে পড়ো সবাই।'

খোলা কার্গো হোল্ডের দরজা দিয়ে দৌড়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল দুই কমান্ডো। রুশ মেজরকে ট্রাক থেকে নামিয়ে আনল সুমন্ত, অন্য দুই কমান্ডোর হাতে তাকে তুলে দিয়ে ব্যস্ত গলায় রূপাকে তাড়া লাগাল ওঠার জন্যে। কিন্তু ওর মধ্যে বিশেষ গরজ দেখা গেল না, পিছনদিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন।

টোগোর ১০৬ এমএমের একটা রাউন্ড এসে পড়ল অবশিষ্ট খালি তিন তেলের ড্রামের ওপর, তিনটেই বিকট শব্দে ছিট্‌কে শূন্যে উঠে গেল। তাই দেখে আঁতকে উঠল সুমন্ত। ভাগ্য ভাল খালি ছিল ওগুলো, নইলে এই ধাক্কাতেই কাজ হয়ে যেত ডাকোটার। জ্বলন্ত তেল আর গ্যাসোলিন পড়ে নির্ঘাত আগুন ধরে যেত. আরেকটা শেল পড়ল প্লেনের পিছনে রানওয়েতে, অজস্র স্প্লিন্টার ঠক্-ঠক্ করে ফিউজিলাজে বিঁধতে কেঁপে উঠল ওটা।

ভেতরে থাবা মেরে স্টার্টার সুইচ অন করল হ্যারিসন, থ্রটল ওপেন করে গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচাল সুমন্তর উদ্দেশে, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কোন ঘোড়ার ডিম পাড়ছ তোমরা?'

দ্বিধা ঝেড়ে খপ্ করে রূপার বাহু চেপে ধরল যুবক, ওকে নিয়ে ছুটল গ্যাংওয়ের দিকে। অবশিষ্ট কমান্ডোরাও উঠে পড়ল হুড়মুড় করে। পোর্ট এঞ্জিন স্টার্ট নিয়েছে আগেই, এবার বাকি এঞ্জিনটাও চালু হলো সগর্জনে। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না পাইলট, সময় হতেই প্লেন রানওয়ের উত্তর প্রান্তের দিকে গড়িয়ে দিল। দক্ষিণে যাওয়াই ভাল ছিল তার জন্যে, কিন্তু অন্যদের তাতে সমস্যা হবে প্লেনে উঠতে অনেক পথ ছুটতে হবে।

কার্গো হোল্ডের খোলা দরজায় অবস্থান নিয়েছে কিছু কমান্ডো, এদিকে সুমন্ত ও রূপাসহ আরও কয়েকজন বাঁটের গুঁতোয় জানালার কাঁচ ভেঙে পথ করে নিয়ে সমানে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে টোগোর মরিয়া বাহিনীর ওপর ওদিকে রানা ও হ্যানস এঁকেবেঁকে প্রাণপণে ছুটছে চলন্ত প্লেনের দিকে। ওদের পিছনেই রয়েছে হ্যানসের চার যোদ্ধা, ৫৫ এমএম ও লাইট আর্মসের সাহায্যে পিছু লেগে থাকা শত্রুর দিকে থেমে থেমে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে সেই সাথে পিছুও হটছে।

১০৬ এমএম গান ক্রুদের মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম দিচ্ছে না কর্নেল, বিরতি না দিয়ে গুলি চালিয়ে যেতে বলছে, একইসঙ্গে প্লেনের মত অতবড় টার্গেট মিস্ করার জন্যে তাদের চোদ্দ গুষ্টির পিণ্ডিও চটকাচ্ছে অনবরত গালাগালির মাধ্যমে। ওদিকে চলতে শুরু করে দিয়েছে ডাকোটা; মুশকিলের কথা হলো!

সৈন্যরা সবাই উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে, যেদিকে সামান্য নড়াচড়া দেখছে, সেদিকেই অন্ধের মত গুলি করছে। গাছ-ঝোপ, কিছুই রেহাই পাচ্ছে না তাদের

হাত থেকে। এতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল টোগো। 'সীজ ফায়ার, গাধার দল! বাতাসে গুলি করতে বলা হয়নি তোমাদের। টার্গেট দেখে করো।'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই রিয়ার গার্ড কমান্ডোদের ব্রাশ ফায়ারে ল্যান্ড-রোভারের উইন্ডশীল্ড গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। মাটিতে ঝাঁপ দিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠল সে, 'গুলি করছিস না কেন, হারামীর দল!'

কাঁচের স্প্লিন্টারে চেহারা পাল্টে গেছে টোগোর, রক্তে ভেসে যাচ্ছে নাকমুখ।

তখনও পুরোপুরি ধাতস্থ হয়ে উঠতে পারেনি রানা, তবু ওই অবস্থায়ই ছুটছে হ্যানসের নির্দেশিত পথ ধরে, রানওয়ের উত্তর মাথার দিকে। পাশ থেকে ওকে সাহায্য করছে প্রকাণ্ডদেহী জার্মান। হঠাৎ করে থেমে দাঁড়াল লোকটা, দুই কমান্ডোর ওপর রানার ভার ছেড়ে দিয়ে ঘুরে আরেকদিকে ছুটল। কিছু সন্দেহ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা, কিন্তু তাকে দেখতে পেল না কোথাও।

হ্যানস তখন ঝোপ-গাছ এসবের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে শত্রু বাহিনীর পিছনে পৌঁছার জন্যে ছুটছে ঝুঁকে পড়ে। ইচ্ছে প্লেনের বড় ধরনের কোন ক্ষতি করে ফেলার আগে ওদের ১০৬ এমএমটাকে অকেজো করে দেয়া। প্রকাণ্ড দেহ নিয়ে যতদূর সম্ভব দ্রুত ছুটছে সে।

ওদিকে একধারসে খিস্তি আর স্ট্যান্ড কোর্ট মার্শালের হুমকিতে একসময় কাজ হলো, পথে এল টোগোর সৈন্যরা। তাদেরকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে এয়ারস্ট্রিপের দিকে ডবল মার্চ করে এগোবার নির্দেশ দিল সে। রিকয়েললেসের গানারদের প্লেন সই করে আরও কয়েক রাউন্ড ছুঁড়তে বলে সামনে তাকাল, দেখতে পেল রানওয়ের উত্তর মাথায় দাঁড়িয়ে আছে তার আসল শত্রু। আরও দুজনের সাথে প্লেনে চড়ার অপেক্ষায় আছে। ওদিকেই যাচ্ছে ডাকোটা।

মাথার ওপর দিয়ে তীক্ষ্ণ শিস কেটে উড়ে গেল ১০৬ এমএমের এক রাউন্ড, ঠিক ওটার সামনেই পড়ল, তবে বিশ গজ আগে। বিস্ফোরিত হয়ে লাফিয়ে উঠল রানওয়ে, বিরাট এক গর্ত হয়ে গেল। শেষ মুহূর্তে প্লেনের নাক ঘুরিয়ে ওটাকে পাশ কাটাল হ্যারিসন। ফলাফল দেখে রিকয়েললেসের তিন ক্রু খুশি হলো, দ্রুত নতুন করে অ্যাডজাস্ট করল সাইট এবারের রাউন্ড সোজা প্লেনের নাকের ওপর পড়বে, কোন সন্দেহ নেই তাতে।

অতিমাত্রায় উত্তেজিত ছিল লোকগুলো, তাই পিছনে, বাঁদিকে যে সাক্ষাৎ মৃত্যু উঠে দাঁড়াচ্ছে, সেদিকে খেয়ালই নেই। ট্রিগারের দিকে হাত বাড়িয়েছিল গানার, তখনই গর্জে উঠল হ্যানস ল্যাংসডর্ফের অস্ত্র। ৭.৬২ এমএম-এর ব্রাশ ফায়ারে ঝাঁঝরা করে দিল তিনজনকেই। একই সাথে একটা গ্রেনেডও ছুঁড়ল সে, ওটা পড়ল কাছেই রাখা কয়েকটা গোলার বাক্সের ওপর

ব্রাশ ফায়ারের শব্দে বিস্মিত হয়ে ঘুরে তাকিয়েছিল কর্নেল, তখনই গ্রেনেডটাকে উড়ে আসতে দেখল। 'ডাউন!' বলে চিৎকার করেই মাটিতে ঝাঁপ দিল সে, এক গড়ান দিয়ে চিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে মাটি কাঁপিয়ে ভয়াবহ শব্দে একের পর এক গোলা ফাটতে লাগল। একই সঙ্গে হেভি রিকয়েললেস রাইফেলটা

যেন ডানা মেলে দিল শূন্যে। দুমড়ে-মুচড়ে কম করেও পঞ্চাশ ফুট দূরে গিয়ে পড়ল ওটা। একটা গোলার বাক্স আগুনের বড়সড় নলের মত আকাশে উঠে বিস্ফোরিত হলো, ফুলঝুরির মত ছড়িয়ে পড়ল সৈন্যদের কয়েকজনের গায়ে। কাজ ফেলে তিড়িংবিড়িং লাফ শুরু করে দিল তারা, উন্মত্তের মত দেহের এখানে-সেখানে চাপড় মেরে ব্যস্ত হয়ে পড়ল আগুন নেভাতে।

বেশিরভাগ অল্পে রেহাই পেলেও কয়েকজনের সে সৌভাগ্য হলো না। আগুন ভালমতই ধরেছে কাপড়ে। চিৎকার করতে করতে ইউনিফর্ম, শার্ট-ট্রাউজার্স ধরে এলোপাতাড়ি টানা-হ্যাঁচড়া করতে লাগল তারা। কিন্তু খুব একটা সুবিধে হলো না, সাদা ফসফরাস কাপড় খাওয়া শেষ করে চামড়া খাওয়া শুরু করে দিয়েছে চোখের পলকে।

লম্ফ-ঝম্পে ব্যস্ত লোকগুলোর ওপর পুরো একটা ক্লিপ শেষ করে ক্ষান্ত দিল জার্মান। অনেক হয়েছে, আর দরকার নেই। এখন প্লেন ধরার জন্যে ছুটতে হবে তাকে। স্ট্রিপের প্রায় শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে ওটা।

আট

সামনে নজর আটকে আছে হ্যারিসনের। ভয়ে ঘামছে দরদর করে। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে এখনই বুঝি একটা গোলা এসে পড়ল প্লেনের ওপর, মিটে গেল বুঝি পালানোর সাধ। তবে ভাগ্য ভাল যে সময় গড়াচ্ছে, তার সঙ্গে প্লেনটাও। এবং তেমন কোন বিপদ ঘটছে না।

লীডার ও দুই কমান্ডো যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেদিকে এগোচ্ছে হ্যারিসন। হঠাৎ খেয়াল হলো হ্যানস নেই সেখানে। অনেকক্ষণ হলো লোকটাকে চোখে পড়েনি তার। ব্যাটা গেল কোথায়? ভাবল সে। একমুহূর্ত পর ভয়ঙ্কর এক বিস্ফোরণের শব্দে চমকে উঠে বাইরে তাকাল, দেখল দীর্ঘ টিউবওয়ালা ১০৬ এমএমটা শূন্যে ডিগবাজি খেতে খেতে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল তার। ভাবল, এটা তাহলে ওই ব্যাটারই কাজ। যাক, বাবা! বাঁচা গেল। ব্লাডি গুড! ব্লাডি গুড! আপনমনে মাথা নাড়তে লাগল লোকটা। অনেক হয়েছে, এবার ফিরে এসো তাড়াতাড়ি। চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়তে ঝট করে বাইরে তাকাল সে, দেখল পাশাপাশি সার বেঁধে ছুটে আসছে একদল সৈন্য। মাঝেমধ্যে থেমে কোমরের কাছ থেকে গুলি করছে, পরক্ষণে আবার ছুটছে।

এখনও বেশ দূরে আছে যদিও, কিন্তু তবু পুরানো ভয়টা ফিরে এল হ্যারিসনের। একটা গুলি যদি বাই চান্স উইং ট্যাঙ্কে বেঁধে, তাহলে তীরে এসে তরী ডুববে। 'কাম অন, হ্যানস, ইউ ব্লাডি ক্রাউট!' বিড়বিড় করে বলতে লাগল সে। 'কাম অন, কাম অন, কাম অন!'

ওদিকে আছড়ে পড়েই ধড়মড় করে উঠে বসল ল্যাংসডর্ফ, তাকিয়ে দেখল গলগল করে রক্ত ঝরছে তার বাঁ পায়ের পিছনদিক থেকে। হাত দিয়ে ক্ষতটা পরখ করে দেখল সে–নিরেট গোল একটা ফুটো আঙুলে ঠেকল। শত্রুর এসকে এস অ্যাসল্ট রাইফেলের একটা বুলেট ঢুকে গেছে মাংসল গোছার ভেতরে। ওটার ধাক্কাতেই আছাড়টা খেয়েছে। গুরুত্ব না দিয়ে উঠে পড়ল সে। এখন থেমে থাকার সময় নয়, শত্রুরা রানওয়ের উত্তর প্রান্তে প্রায় পৌঁছে গেছে।

দুই সঙ্গীর সাথে রানা ওদেরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করছে প্রাণপণে, কিন্তু ওরা সংখ্যায় বেশি বলে সুবিধে করতে পারছে না। তাকে যেতে হবে, সাহায্য করতে হবে রানাকে। প্রতি পদক্ষেপে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে, কিন্তু আমল দিচ্ছে না সে। ভাবছে, পা-টা যখন উড়ে যায়নি, তখন বুঝতে হবে বুলেটটা কপার জ্যাকেটের সাধারণ মিলিটারি ইস্যুই হবে। সফ্‌ট নোজ্‌ড বা ডামডাম নয়। কাজেই এ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে দৌড়ে চলল সে।

এদিকে রানাদের অনেক কাছে এসে পড়েছে প্লেন। ভেতরের প্রায় সবাই জানালায় যার যার অস্ত্র নিয়ে তৈরি আগুয়ান দলটাকে ঠেকাতে। ঠিকমত অ্যাঙ্গেল যদিও পাচ্ছে না, তবু গুলি ছুঁড়ে ভয় দেখিয়ে কিছুটা হলেও দেরি করিয়ে দেয়া যাবে, এই ভরসায় আছে সবাই।

ওদিকে কয়েক পা যেতে না যেতে আবার গুলি খেল ল্যাংসডর্ফ। একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ছোঁড়া বুলেটের আঘাতে গোটা বাঁ হাতটা সকেট থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলে পড়ল। গুঙিয়ে উঠল সে, এক পাক খেয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে ডান কাঁধ দিয়ে।

গুলিটা করেছে টোগোর নিজের ট্রাইব, লুবার সদস্য। ওকে আরেক গুলিতে খতম করে ফেলার ইচ্ছে ছিল লোকটার, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফেঁসে গেল নিজেই। তার একে-র কার্ট্রিজের একটা কেসিং জ্যাম করে দিয়েছে বোল্ট, চেম্বারের ভেতরে রয়েছে ওটার অর্ধেক, বাকি অর্ধেক বাইরে। উন্মত্তের মত বোল্ট ধরে টানাটানি করছে সে, এই ফাঁকে উঠে পড়ল ল্যাংসডর্ফ।

ডান দিকে কাস্তে চালানোর মত করে হাড় গুঁড়ো করা এক রদ্দা চালাল লোকটার গলার বাঁ পাশে। এমনভাবে ধসে পড়ল লুবা, মনে হলো কে যেন তার পা জোড়া একটানে খুলে নিয়ে গেছে জায়গা থেকে। ঠিকমত পড়ার সময় দিল না জার্মান, হ্যাঁচকা টানে অস্ত্রটা কেড়ে নিয়েই ভারী বাঁটের এক বাড়িতে তার খুলিটা ইঞ্চিচারেক দাবিয়ে দিল ভেতরে। মরার আগে 'ট্যাঁ' করার সময়টাও পেল না সে।

একে ফেলে নিজের জি-থ্রী তুলল লোকটা, ধারেকাছে আর কোন শত্রু নেই দেখে আবার ছুটতে শুরু করল। টিস্যু ও চামড়ার সাথে ঝুলছে অকেজো বাঁ হাত, প্রতিটা ঝাঁকিতে দুলে উঠে নরক দেখিয়ে আনছে বারবার।

ওদিকে যে চোট কোন সাধারণ মানুষকে জীবনের তরে পঙ্গু করে দিতে পারত, সেই আঘাতের ধাক্কা সামলে নিজেকে ফিরে পেয়েছে মাসুদ রানা। মাথা ঝাড়া দিয়ে মস্তিষ্কের ধোঁয়াটে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখল ও। একদিকে প্লেন কাছে এসে গেছে, অন্যদিকে টোগোর সৈন্যরাও। গুলি ছুঁড়তে

ছুঁড়তে আসছে। ওদের অগ্রগতি ঠেকাতে দুই সঙ্গীকে গুলি চালাবার নির্দেশ দিল, নিজেও সমানে চালাতে লাগল। কাজ হলো তাতে, আগের মত বুক ফুলিয়ে আসা বন্ধ করতে বাধ্য হলো ব্যাটারা। আড়ালে আড়ালে এগোচ্ছে এখন, ফলে গতি কমে গেছে অনেকটা।

এভাবে কতক্ষণ চলল জানে না রানা, হঠাৎ বাঁদিক থেকে একটা চিৎকার ভেসে আসতে ঘুরে তাকাল। কাউকে দেখতে না পেয়ে প্রথমে ভেবেছিল শুনতে ভুল হয়েছে, কিন্তু পরক্ষণে ধারণাটা ভাঙল। বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল ল্যাংসডর্ফের অবস্থা দেখে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে আসছে সে, কাঁধ থেকে গোটা দেহের বাঁদিকটা রক্তে ভাসছে। যন্ত্রণায় বিকৃত মুখটা প্রিয় বন্ধু, অফুরন্ত হাসির ভাণ্ডার সেই ল্যাংসডর্ফেরই, বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো ওর। মাটিতে রক্তের মোটা ধারা রেখে হেঁটে আসছে মানুষটা, তার পাশ ঘেঁষে একের পর এক বুলেট ছুটে যাচ্ছে।

তাকে ধরার জন্যে উঠে পড়েছিল রানা, কিন্তু দু'পা গিয়েই এক হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ল। জি-থ্রী তুলে ল্যাংসডর্ফের পিছনের একটা গাছ লক্ষ্য করে দ্রুত তিনবার সংক্ষিপ্ত ব্রাশ করল। একটা মরণ চিৎকার কিছুটা স্বস্তি এনে দিল ওকে। তক্ষুণি সঙ্গী দু'জনকে পাঠাল আহত জার্মানকে কাঁধে তুলে নিয়ে প্লেনের দিকে ছুটতে, ওদেরকে কাভারিং ফায়ার দিতে নিজে থাকল পিছনে।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ডেপুটি লীডারকে উদ্ধার করতে ছুটে গেল দুই কমান্ডো। তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে প্লেনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল আড়ালে উত্তর প্রান্তে পৌঁছে ঘুরতে শুরু করেছে তখন ডাকোটা, এতক্ষণে বাগে পেল ওটাকে সরকারী বাহিনী। নরম ফিউজিলাজ ভেদ করে গণ্ডা গণ্ডা বুলেট ঢুকতে লাগল ভেতরে। কার্গো হোল্ডের মধ্যে ক্ষিপ্ত বোলতার মত ছোটাছুটি করছে সেগুলো।

প্লেনের ঘোরা শেষ হতেই একযোগে গর্জে উঠল জানালায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ কমান্ডোদের অস্ত্র এবার তারাও বাগে পেয়েছে ব্যাটাদেরকে। ওদিকে সুমন্ত কার্গো ডোরের সামনে ৬০ এমএম মর্টার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওটার বাঁট-প্লেট হাত দিয়ে ঠেকিয়ে একের পর এক গোলা ছুঁড়ে চলেছে শত্রু লাইন বরাবর।

এদিকে রানার প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে কর্নেল টোগোর বাহিনী, মিনিটে মিনিটে তাদের সংখ্যা বাড়ছে। কাজেই সতর্কতার সাথে গুলি ছুঁড়ছে রানা। এক গাছ থেকে আরেক গাছের অথবা ঝোপের আড়ালে যাচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। এগোবার ফাঁকে দেখেশুনে ট্রিগার টানছে। ফলে কিছুটা হলেও রুদ্ধ হয়েছে শত্রুর গতি ক্লিপ বদলাবার সময় পিছনে এক পলক তাকাল ও, দেখতে পেল অনেকগুলো হাত বেরিয়ে এসে দুই কমান্ডোর কাঁধ থেকে ল্যাংসডর্ফকে তুলে নিল। অদৃশ্য হয়ে গেল তার প্রকাণ্ড দেহটা কমান্ডোরাও হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে পড়ল।

খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে তারস্বরে রানাকে দৌড় দিতে বলছে রূপা-সুমন্ত।

দুজনেই তাকিয়ে আছে ওর পিছন দিকে। ওদিকে শেষ দৌড় শুরু করে দিয়েছে হ্যারিসন, তবে রানার সুবিধের জন্যে ধীরগতিতে এগোচ্ছে। হাত ইশারায় হ্যারিসনকে স্পীড আরও বাড়াতে বলে পিছন ফিরে দু'বার সংক্ষিপ্ত ব্রাশ করল রানা, একটু বিরতি দিয়ে আরও দু'বার। তারপর আড়াল ছেড়ে প্রাণপণে ছুটল চলন্ত ডাকোটার কার্গো ডোর লক্ষ্য করে, কোনাকুনি।

সেকেন্ডে সেকেন্ডে গতি বাড়ছে ওটার, রানাও সমান তালে ছুটছে, ভেতর থেকে সবাই চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছে ওকে, কয়েকটা সমর্থ হাত বেরিয়ে আছে সাহায্য করার জন্যে। ওগুলোকে অগ্রাহ্য করে ডোরফ্রেম লক্ষ্য করে থাবা চালাল রানা, কয়েক চুলের জন্যে মিস হলো প্রথম চেষ্টা। সঙ্গে সঙ্গে আবার হাত বাড়াল, চার আঙুলের মাথা দিয়ে ধরে ফেলল ফ্রেম, কয়েকটা হাত এগিয়ে এল ওটা ধরার জন্যে।

ঠিক তখনই উরুতে গুলি খেল রানা, তীব্র ব্যথার একটা ধারা বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গিয়ে খবরটা ব্রেনকে জানান দিতেই গুলিবিদ্ধ পা ভাঁজ হয়ে গেল, পড়ে গেল ও রানওয়েতে। অনেকগুলো শুভাকাঙ্ক্ষী চেহারা চোখের সামনে থেকে মুহূর্তে দূরে সরে গেল হায় হায় করছে ওরা দেখতে দেখতে প্লেনের সাথে ওর ব্যবধান ত্রিশ ফুটে গিয়ে দাঁড়াল।

টোগো এ মুহূর্তে রানওয়ের উত্তর প্রান্তে বসে টার্গেট প্র্যাকটিস করছে, রানার খুব ভাল জানা আছে তা। প্লেন ঠেকানোর চেষ্টা করছে মরিয়া হয়ে। এরকম সময়ে যদি প্লেনের গতি কমাতে হয়, সবাইকে মরতে হবে, তা বোঝে কাজেই উঠে পড়ল ও, ডাকোটার পিছন পিছন ছুটল প্রাণপণে।

মনের শেষ শক্তিটুকু ব্যয় করে লক্ষ্যে পৌঁছে গেল, কোনমতে টেইলের গাইড লাইন ধরে ফ্ল্যাট ব্লেডের ওপর তুলে ফেলল নিজেকে সুমন্ত চাইছিল কার্গো বে থেকে নেমে সাহায্য করবে ওকে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে অনেক কষ্টে ইচ্ছেটা দমন করল কোন লাভ হবে না বুঝতে পেরে। তাতে বরং সে-ও বিপদে পড়বে।

ওদিকে পিছনের অবস্থা দেখার জন্যে ককপিটের জানালা দিয়ে তাকিয়েছিল হ্যারিসন, কিন্তু এক মুহূর্ত পরই সাঁৎ করে মুখ ভেতরে টেনে নিতে বাধ্য হলো। আরেকটু হলে একটা কান হারাতে যাচ্ছিল সে প্লেনের গায়ে ঘষা খেয়ে দিক বদল করা বুলেটের আঘাতে। তবে ওর মধ্যেই লীডারকে দেখতে পেয়েছে সে, ফ্ল্যাট ব্লেডের ওপর বসে আছে। কি করবে বুঝতে না পেরে সমস্যায় পড়ে গেল হ্যারিসন।

ও জানে, এখন গতি কমালে সামনের অবশিষ্ট রানওয়ে বেকার হয়ে যাবে, নতুন করে দৌড় শুরু করা যাবে, কিন্তু শেষ করা যাবে না। ওড়ার মত গতি অর্জন করতে পারবে না ডাকোটা। আর যদি দৌড় বজায় রেখে টেক-অফ করতে যায়, স্টিক টানামাত্র ছিটকে পড়ে যাবে লীডার কি করবে সে এখন?

রানাও বুঝল সমস্যাটা, তাই দ্রুত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। প্লেন হ্যাঙ্গার বরাবর পৌঁছতে লাফিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে। গতির সাথে তাল বজায় রাখতে পরপর দুটো ডিগবাজি খেল সামনে মুখ করে। পরক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল হ্যারিসনের উদ্দেশে। 'চলে যাও!' চিৎকার করে বলল ও। 'আমার জন্যে ভাবতে

হবে না! এখনও সময় আছে, ম্যান! উঠে পড়ো, ফর গড'স সেক্! পালাও!'

ভেতরে রাগে-দুঃখে, বেদনায়-ক্ষোভে ফেটে পড়ল রূপা, রানাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাতে ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে হচ্ছে বলে রীতিমত উন্মাদিনী হয়ে উঠল। অসহায় আবেগ প্রকাশ করতে চাইল চিৎকার করে, কিন্তু কান্না এসে থামিয়ে দিল। ধপ্ করে ফ্লোরে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল ও। অন্যদিকে সুমন্ত পাথর হয়ে গেছে। রানাকে আর দেখতে পাচ্ছে না পিছিয়ে পড়েছে বলে, কিন্তু তবু দরজা ছেড়ে নড়ছে না সে। চার হাত-পায়ে ভর করে সামনে তাকিয়ে গাছ, ঝোপ, টিলা ইত্যাদির উল্টোমুখো দৌড় দেখছে।

হঠাৎ সচকিত হলো সে। একটা জি-থ্রী, গুলি ও গ্রেনেডের একটা বাক্স এবং একটা রেশন প্যাক চট করে ফেলে দিল নিচে। কেন কাজটা করল সুমন্ত নিজেও জানে না। ওদিকে আস্তিনে চোখ মুছে থ্রটল আরও সামনে ঠেলে দিল হ্যারিসন, গতির সাথে নাক থেকে লেজ পর্যন্ত কাঁপুনি বেড়ে গেল ডাকোটার। বেশ কিছুক্ষণ উঠি-উঠি করে অবশেষে উঠে পড়ল ওটা।

পোর্ট সাইডে বাঁক নিল হ্যারিসন, দেখতে পেল ফেলে দেয়া জিনিসগুলোর কাছে পৌঁছে গেছে রানা। অক্ষত এক জানালার কাঁচে কপাল ঠেকিয়ে বসে ছিল রূপা, প্লেনটা ঘুরতেই রানার ওপর চোখ পড়ল। কান্না ভুলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ও। কর্নেল টোগোর অবস্থানের দিকে গুলি ছুঁড়ছে রানা, পা টেনে টেনে ছুটছে হ্যাঙ্গারের দিকে।

হ্যাঙ্গারের অন্য মাথা দিয়ে বেরিয়েই একটা হুডখোলা জীপ দেখতে পেয়ে থমকে গেল রানা। খুশি হয়ে উঠল হাঁটার কষ্ট অন্তত বাঁচবে বলে। এখন চললে হয়। উঠে বসে স্টার্টার টিপে দিল ও, গুঞ্জন করে উঠল ফাইন টিউনড্ এঞ্জিন। যাক্, বাঁচা গেল, ভাবল খুশি হয়ে। ওকে ধরতে হলে আরও একটু কষ্ট করতে হবে কর্নেল ব্যাটাকে।

ওদিকে রানা পড়ে যাওয়ায় প্লেন হাতছাড়া হওয়ার দুঃখ ভুলে গেল কর্নেল। আসলটাকে পাওয়া গেছে, তাকে দিয়েই ক্ষতি যতদূর সম্ভব উসুল করতে হবে তাকে। এ ছাড়া আর কোন উপায়ও অবশ্য নেই।

এদিকে আরেক চক্কর দিল হ্যারিসন ফিল্ডের ওপরে। কিসের টানে যেন জায়গা ছেড়ে সরতে মন চাইছে না। হঠাৎ ছোটখাট একটা ধুলোর মেঘ দেখে চোখ কুঁচকে ভাল করে তাকাল লোকটা, দক্ষিণ দিকে ধাবমান একটা জীপ দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ককপিট ফাটিয়ে ফেলার জোগাড় করল। পিছনের সবাই চমকে উঠল পাইলট গুলি খেয়েছে ভেবে, হুড়মুড় করে ছুটে এল সুমন্ত। লোকটাকে হাসতে দেখে থমকে গেল দোরগোড়ায়।

'কি ব্যাপার!'

হাত তুলে ব্যাপার দেখাল হ্যারিসন। এবার ওর পালা, আনন্দে প্লেনের ছাদ উড়িয়ে দেয়ার জোগাড় করল যুবক। মুহূর্তের মধ্যে খুশির বন্যা বয়ে গেল প্লেনের ভেতর। সমস্বরে 'গো! গো! গো!' করে চিৎকার করছে সবাই।

একমাত্র রূপা নিশ্চুপ, একদৃষ্টে জীপটার দিকে তাকিয়ে আছে ও। চোখে

পানি অথচ হাসছে মিটিমিটি। বিড়বিড় করে কী সব বলছে।

অন্যদের দুঃখ বা আনন্দের সাথে কোন সম্পর্ক নেই হ্যানস ল্যাংসডর্ফের। প্লেনে ওঠার একটু পরই জ্ঞান হারিয়েছে সে, এখনও তা ফেরেনি। তার কাঁধ থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে মেড্রিক, কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না বেচারা।

কর্নেল টোগোর ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই, রুশ মেজর আলেক্সেইর সাথে খতম হয়ে গেছে। কিন্তু তা নিয়ে এখন আর আফসোস নেই তার। মানুষের সহ্যক্ষমতা অপরিসীম। সম্রাটের মৃত্যুর খবর পেয়ে বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তার রুখে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা ছিল স্বাভাবিক রিফ্লেক্স। তাও পথে মুখোমুখি হয়ে পড়ায়, ব্যাপারটা তার বেশি কিছু ছিল না।

কিন্তু রুশ মেজর ছিনতাই হওয়ার পরের ঘটনা অন্যরকম। লোকটাকে হারালে তার অস্তিত্ব থাকবে না, তাই রানাকে বাধ্য হয়ে অনুসরণ করেছে টোগো। সেই সাথে মেজরকে উদ্ধার করা সম্ভব না হলে কি ঘটবে, তা নিয়েও মাথা খাটিয়েছে, ফলে না পাওয়ার ক্ষতি সামাল দেয়ার জন্যেও প্রস্তুত করে নিয়েছে মন।

কাজেই শেষ সময়ে লোকটা যখন সত্যিই হাতছাড়া হয়ে গেল, খুব একটা হতাশ হয়নি কর্নেল। বরং যে এ জন্যে দায়ী, তাকে ধ্বংস করার তাগিদ আরও জোরদার হয়েছে তার মধ্যে। রানাকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে দেখে সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে জীবনের চূড়ান্ত ব্রত। সে শেষ হয়ে গেছে, ঠিক আছে, কিন্তু যে তার এই ক্ষতির জন্যে দায়ী, তাকেও সে ছাড়বে না

আক্রোশ অন্ধ, তাই টোগো একবারও ভেবে দেখেনি রানা যা করেছে, শুধু আত্মরক্ষার খাতিরে করেছে। বাধ্য হয়ে করেছে। রানার জায়গায় হলে হয়তো তাকেও একই ধরনের কিছু করতে হত। কিন্তু টোগো কোন যুক্তি মানে না, কখনও মেনে চলার দরকার হয়নি। তার একমাত্র পুঁজি হলো শক্তি আর গোঁয়ার্তুমি।

তাই রানাকে জীপ নিয়ে দক্ষিণে ছুটতে দেখে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল কর্নেল। ব্যাটা যে নরকেই যাক, সে-ও যাবে অনুসরণ করে। মৃত্যু এলে মরবে, কিন্তু শত্রুকে নিয়ে মরবে, একা নয়। লোকটার জীপের পিছু নিতে ট্রাক তেমন কাজে আসবে না, তাই ওগুলো ছেড়ে দেবে সে লোকজনসহ। একজনকে ধরার জন্যে এত লোক আসলে দরকারও নেই।

এক সার্জেন্ট ও সেরা ট্রেনিং পাওয়া দু'জনকে বেছে নিয়ে ল্যান্ড-রোভারে উঠল সে, অন্যদের ফিরে যেতে বলল রাজধানীতে। বিনা প্রশ্নে তার নির্দেশ পালিত হলো দেখে গোপনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল কর্নেল টোগো। ভাগ্য ভাল যে লোকগুলো তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু জানে না। তাহলে এতক্ষণে তাকে জ্যান্ত পুঁতে ফে ত সবাই মিলে।

ধাওয়া শুরু করার আগে হ্যাঙ্গারের টুলস কেজে বন্দী তিন আফ্রিকানকে শেষ করে রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কর্নেল। এখানে কি ঘটেছে, কে কে তাতে যুক্ত ছিল স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সে কথা যত দেরিতে জানবে তত তার সুবিধে

বেআইনীভাবে অন্য দেশে ঢোকার অপরাধে কর্তৃপক্ষের উল্টো ধাওয়া খেতে হবে না। টোগো 'বাস্তববাদী' ও যোদ্ধা। যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত হার মানবে না সে। কিছুতেই না।

তিন আফ্রিকানের 'ব্যবস্থা' করে নিজেই ল্যান্ড-রোভারের ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল সে, রওনা হলো তিন সঙ্গী নিয়ে। জীপের ট্র্যাক ধরে বাধাহীন দ্রুতগতিতে ছুটল দক্ষিণে। যদি শত্রু এভাবে পথ ছেড়ে বেপথে চলতে থাকে, তাহলে উপকার হবে তার। চাষাভূষা ছাড়া আর কারও মুখোমুখি হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকবে না।

লোকটা খুব সম্ভব পুবে যাবে, ভাবছে সে. লেক ভিক্টোরিয়া হয়ে জিম্বাবুইতে ঢোকার চেষ্টা করবে। কিন্তু ওই পথে আর্মড পেট্রলের মুখোমুখি পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। লোকটার যদি এ অঞ্চল সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞানও থাকে, ও-পথে যাবে না সে। কারণ ওটা সবচেয়ে সোজা পথ, সবাই জানে।

তার জায়গায় যদি টোগো হত, জাম্বিজি নদীর দিকে যেত প্রথমে। নদী পার হয়ে ওকাভাঙ্গো সোয়াম্পল্যান্ডের পাশ ঘেঁষে ক্যাপরিভি স্ট্রিপ অতিক্রম করে বতসোয়ানায় ঢুকে যেত। তারপর মাউন ফ্র্যান্সিসটাউন সংযোগ সড়ক বা নাতা বুলাওয়েও সংযোগ সড়ক পার হয়ে কোনাকুনি ঢুকত জিম্বাবুইয়ে।

সে যাই হোক, লোকটা যে পথেই যাক, তার সাথে টোগোর দেখা হবেই। তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং সেটা হবে জাম্বিজি ক্রসিংেই। এ অঞ্চলে জন্ম টোগোর, বড়ও হয়েছে এখানে আজ বর্ডার ব্যবস্থা চালু আছে, কিন্তু এক সময় তা ছিল না। কয়েকটা দেশ ছাড়া গোটা মহাদেশই ছিল উন্মুক্ত।

সে সময় গোটা অঞ্চল জুড়ে ঘুরে বেড়াত সে। কাজেই ক্রসিংে পৌঁছার অনেক সংক্ষিপ্ত পথ চেনা আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সংক্ষিপ্তটা ধরে যাবে সে। তারপর দেখা যাবে ব্যাটা কত সেয়ানা।

স্ট্রিপ ছেড়ে কিছুদূর এসে গুলিবিদ্ধ জায়গায় ব্যাটল ড্রেসিং করে নিয়েছিল, তাই ব্যথাটা কম মনে হচ্ছে এখন। অর্থাৎ টান ধরেছে ক্ষতে।

কিন্তু ওটার কথা এখন ভুলে থাকতে চায় রানা, এ মুহূর্তে কর্নেল টোগোর মুঠো থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। উইন্ডশীল্ড ঠেলে বনেটের ওপর শুইয়ে দিয়ে গতি আরও বাড়াল ও। একটু আগেই দিগন্তে মিলিয়ে গেছে ডাকোটা, চলে গেছে দলের সবাই। এখন আর অন্য কারও চিন্তা নেই, কারও নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হতে হবে না। শুধু নিজের কথা ভাবলেই চলবে।

অন্যমনস্ক ছিল বলে আরেকটু হলেই এক শজারুর ওপর গাড়ি তুলে দিচ্ছিল ও, একদম শেষ মুহূর্তে দ্রুত ওটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটল আবার দিগন্ত বিস্তৃত সমতলভূমি ধরে। মুখে, খোলা বুকে কিছুটা গরম বাতাসের ছোঁয়ায় ভাল লাগছে এখন মাথা খাটানোর মত বিলাসিতা করা যায়, ভাবল রানা।

এতক্ষণে হয়তো কিমশাকার পথ ধরেছে কর্নেল টোগো। সেটাই স্বাভাবিক। এখন আর ওকে তাড়া করার কোন যুক্তি নেই লোকটার। মেজর আলেক্সেই একেবারেই হাতছাড়া হয়ে গেছে, কাজেই শুধু শুধু ওকে তাড়া করে কোন ফায়দা

হবে না এখন হ্যানসের কথা মনে পড়ল। পায়েরটা যেমন-তেমন, কাঁধের ক্ষতটা যথেষ্ট মারাত্মক ছিল। কি অবস্থা এখন হ্যানসের কে জানে! তবে ওদের সঙ্গের মেডিক লোকটাও কাজ ভালই জানে। তার ওপর হারারে পৌঁছতে পারলে ওদের আর্মি হসপিটালের সার্জনদের সাহায্য পাওয়া যাবে, কাজেই আশা করা যায় সুস্থ হয়ে উঠবে সে।

মেজর আলেক্সেইর দুর্ভাগ্যের কথা ভাবল রানা। হারারে পৌঁছামাত্র আসল দুঃস্বপ্ন শুরু হবে তার। প্রেসের সামনে মুখ না খুলে পারবে না সে, আবার খুললেও বিপদ। মুখ বাঁচানো দায় হয়ে উঠবে মস্কোর। আসলে কি করছিল সে কিমশাকায়? ওদের সাথে কি নিয়ে নতুন দহরম-মহরম শুরু করেছিল মস্কো? শ্রাগ করল ও।

এস্কেপ রুট নিয়ে ভাবতে লাগল। এমন পথে যাওয়া চলবে না যে পথে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চোখে পড়ার সম্ভাবনা আছে। তাতে কূটনৈতিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। অনেক ভেবেচিন্তে রুট ঠিক করল ও। টোগো জানতে পারলে নিঃসন্দেহে উল্লসিত হত, কেননা তার অনুমিত রুটেই যাচ্ছে রানা। ঘুরপথে। টোগো যা চাইছিল।

তিন ঘণ্টা চলার পর দূরে এক শহরের দেখা পেল ও। ম্যাপের সাথে মিলিয়ে নিয়ে বুঝল ওটার নাম মানকোয়া–অর্থাৎ ভালই অগ্রগতি হচ্ছে। গাড়ির মালিক সম্ভবত কোন মেকানিক, ভাবল রানা। চমৎকার সার্ভিস দিচ্ছে। ওর সুবিধে হয়েছে তাতে। এই অঞ্চলে একশো মাইল কি তারও বেশি পর পর একেকটা ফুয়েল ডিপো, কাজেই লোকটা জীপ রিফুয়েল করার জন্যে দুই জেরি ক্যান অতিরিক্ত তেলও মজুত রেখেছিল গাড়িতে।

এক ক্যান ট্যাঙ্কে ঢেলে রিফুয়েলিং সারল ও। ক্যান জায়গায় রেখে সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল, তখনই একটা ঝিলিক চোখে পড়ল। মুখ তুলল রানা। তিন কি সাড়ে তিন মাইল উত্তরে আবার ঝিলিক মেরে উঠল। গাড়ির কাঁচ। এদিকেই আসছে।

ওটায় কে আছে দেখার দরকার মনে করল না, কারণ বুঝে ফেলেছে ও কর্নেল টোগো! কিন্তু এখনও ব্যাটা পিছু লেগে আছে কেন বুঝল না। এই অর্থহীন ধাওয়ার কোন কারণ খুঁজে পেল না। ব্যাটা পাগল হয়ে গেল নাকি? এক দেশের আর্মি অফিসার আরেক দেশের ভেতরে ঢুকে...নাহ্, পাগলই হয়ে গেছে লোকটা।

হোক বা না হোক, তার পিছনে মাথা ঘামাতে গিয়ে সময় নষ্ট করতে রাজি নয় রানা। এখন সরে পড়তে হবে। প্লেন থেকে সুমন্তর ছুঁড়ে দেয়া রেশন প্যাক থেকে একটা ক্যান্ডি বার নিয়ে মুখে পুরল ও। জিনিসটাকে মুখের ভেতর আপনা থেকে গলে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে একটু একটু করে গিলে ফেলল, দু'ঢোক পানি খেয়ে গলার মিষ্টি ভাবটা ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে গাড়ি ছাড়ল।

খুব ক্লান্ত রানা। তার ওপর এত লম্বা ড্রাইভে সাহায্য করারও কেউ নেই। ঘুমের অভাবে চোখ জ্বলছে। মিশন নিয়ে রওনা করার আগের রাতে শেষ ঘুমিয়েছিল ও। সেটা কবে? তিনদিন না চারদিন আগে? পুরানো চার সিলিন্ডার জীপের ভোঁতা নাক পুবে ঘুরিয়ে দিল। মানকোয়া শহর পাশ কাটিয়ে লুসাকার দিকে চলল। সেখানে পৌঁছে আবার দক্ষিণমুখো হবে

গতি একটু একটু করে বাড়িয়ে চলল ও।

সার্জেন্টের হাতে ল্যান্ড-রোভারের ভার তুলে দিয়েছে কর্নেল টোগো। পাশের সীটে আধশোয়া হয়ে ঘুমাচ্ছে সে। তার বিশ্রামের দরকার আছে। বিশ্রাম-ঘুম ছাড়া একটানা কতদিন কাজ করা যায়?

ছয়দিন আগে, খুব ভোরে কিমশাকা ছেড়েছে সে। দুইশো সৈন্যের বড়সড় এক বাহিনী নিয়ে দক্ষিণের এক গ্রামে গিয়েছিল 'বিদ্রোহ দমন' করতে। তিনদিনে বিদ্রোহের গাছটাকে গোড়াসহ উপড়ে ফেলে ফিরে আসার পথে পড়ল এই যন্ত্রণায়। আবার তিনদিনের ধাক্কা। আর কত?

সামনের জীপটাকে প্রথমবার দেখতে পাওয়ামাত্র নিশ্চিত হয়ে গেছে টোগো, বুঝে ফেলেছে তার অনুমান মিথ্যে হয়নি। একদম ঠিক আছে হিসেব।

লুসাকা ছাড়িয়ে পুবে যাবে সে, বিশাল এক অর্ধবৃত্ত রচনা করে কোনাকুনি পাড়ি দেবে ফ্ল্যাটল্যান্ড, আগে চলে যাবে রানার। জাম্বিজি ক্রসিঙের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করবে।

গ্যাবরন। বতসোয়ানা।

টেলিফোনে বসকে বাসায় ধরল মেজর ফরবস্। উত্তেজনা দমন করে রেখেছে অনেক কষ্টে। 'সুখবর আছে, স্যার। আমাদের জিম্বাবুইয়ান বন্ধুরা এইমাত্র যোগাযোগ করেছিল। বলল, মেজর রানার পাইলট একটু আগে তাদেরকে রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছে। সে বলছে, তার সাথে নাকি কিছু আহত কমান্ডো আর আমাদের জন্যে এক বিশেষ অতিথি আছে।'

'আমাদের অতিথি?' চাপা বিস্ময় ফুটল বসের কণ্ঠে।

'রাইট, স্যার। পাইলট বলেছে, তার সাথে আলোচনা করলে আমরা নাকি অনেক উপকৃত হব।'

কিছুক্ষণ বসের উত্তেজিত কণ্ঠ শুনল সে। হাসছে, মাথা দোলাচ্ছে সমর্থনের ভঙ্গিতে।

'রাইট, স্যার। আমি মেজর রানার লোকেদের সবাইকে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিতে বলেছি। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে এসে পড়বে তারা।'

নয়

পরিস্থিতি খুব একটা সুবিধের মনে হলো না মেজর ফরবসের। খুশি হতে পারছে না সে। প্রথমে যেমন হবে ভাবা হয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে তা হয়নি। কেঁচে গেছে। কিমশাকার প্রেসিডেন্ট হারামজাদা মরেছে ঠিকই, কিন্তু একটা বড় সমস্যার জন্মও দিয়ে গেছে।

সত্যিই যদি মস্কোর সাথে তার কোন গোপন চুক্তি হয়ে থাকে, তাহলে হয়তো প্রেসিডেন্ট নকুমাকে সমস্যায় পড়তে হবে। কমিউনিজম বিসর্জন দিতে বাধ্য হলেও গোঁয়ার্তুমি এখনও ছাড়েনি মস্কোর ক্ষমতাসীনরা। বলকানে সম্প্রতি এর প্রমাণ রেখেছে তারা। হয়তো আফ্রিকাতেও রাখবে। 'চুক্তি'র বলে দুম্ করে সৈন্য পাঠিয়ে বসবে কিমশাকায়। সরাসরি পাঠালে সবার প্রতিবাদের মুখে পড়তে হবে জানা কথা, তাই খুব সম্ভব অন্য কোন পথ ধরবে ওরা।

সেটা কি হতে পারে? ভাবছে মেজর। মাসুদ রানার হাতে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ধরা পড়া রুশ কর্নেল আলেক্সেই স্বীকার করেছে কিমশাকার স্বেচ্ছাচারী প্রেসিডেন্টের সাথে তার দেশ খুব সম্প্রতি নতুন এক গোপন চুক্তি করেছে। কিমশাকার যে-কোন সমস্যায় মস্কো তার পাশে দাঁড়াবে বলে শর্ত রয়েছে সেটায়।

তা কি করবে ওরা? সারা পৃথিবী জানে লগুম্বা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সাংবিধানিক সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতায় বসেছিল। অবৈধ ছিল সে। তার ওপর এ মুহূর্তে মৃত, প্রেসিডেন্ট নকুমা দেশে ফিরে নিজেকে এরমধ্যেই প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন। জিম্বাবইয়ে নিজের স্বার্থে তাঁর সরকারকে অভিনন্দনও জানিয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে মস্কো কি সেই চুক্তি বহাল রাখার চেষ্টা করবে? উচিত হবে না সেটা। সারা পৃথিবীর ধিক্কারের মুখে পড়তে হবে তাহলে মস্কোকে।

কূটনৈতিক লড়াইয়ের ফল কি হবে কে জানে! সোডিয়াম পেন্টাথলের চুলকানী সহ্য করতে না পেরে কর্নেল আলেক্সেই কিমশাকা-রাশিয়ার চুক্তি সম্পর্কে লিখিত স্বীকারোক্তি দিয়েছে, বিভিন্ন পশ্চিমা দেশের পথে রওনা হয়ে গেছে তার কপি। ফেডারেশন অভ আফ্রিকান ইউনিটিভুক্ত প্রতিটা দেশেও গেছে। আশা করা যায় ওতেই কাজ হবে। শুভবুদ্ধির উদয় হবে মস্কোর।

কিন্তু যদি না হয়?

কর্নেল আলেক্সেইর কথা ভাবল মেজর ফরবস্। এক ইঞ্জেকশনেই পথে এসে গেছে লোকটা। উপায় নেই বুঝতে পেরে নিজেকে বাঁচাতে মস্কোর খুব গোপন এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্ল্যান বরবাদ করে দিয়েছে। একটু পর ভিডিও করা হবে তার, ক্যামেরার সামনে পুরো প্ল্যান ব্যাখ্যা করবে লোকটা। ওটা তাড়াতাড়ি প্রচার হলে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাহলে হাত গুটিয়ে নেবে রাশিয়া।

এদিকে আরেক সমস্যা হচ্ছে মেজর মাসুদ রানা। কোথায় যে আছে সে, ঈশ্বর মালুম। এখনও বেঁচে আছে বলে মনে করে না সে। যদি থেকেও থাকে, হয়তো বন্দী হয়েছে, অথবা...। এদিকে হ্যানস ল্যাংসডর্ফ, মেজর রানার জার্মান বন্ধু খুব ভোরে মারা গেছে আজ। দুঃখজনক ঘটনা। অল্পদিনের পরিচয় হলেও লোকটাকে ভাল লেগে গিয়েছিল ফরবসের। তার মৃত্যুর খবর যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছে। এখন মেজর রানার ব্যাপারে তেমন কোন খবর না শুনতে হলেই বাঁচে সে। কোথায় আছে মানুষটা? বেঁচে আছে তো?

উপুড় হয়ে শুয়ে আছে রানা। ভোরের সূর্যের আলো পড়েছে প্রায় শুকনো জাম্বিজির বাদামী বুকে। হালকা কুয়াশা উঠছে পানি থেকে। শুকনো মুখের ভেতরটা ভেজা-

ভেজা হয়ে উঠেছে তার কারণে। ভালই লাগছে।

এ মুহূর্তে চারদিক নীরব। একটু আগে কেউ একজন কারও নাম ধরে ডাকাডাকি করেছে কয়েকবার। খুব সম্ভব সবশেষে যে লোকটা ওর হাতে মরেছে, তাকেই ডাকা হচ্ছিল। রানা আশা করেছিল কর্নেল টোগো লোকটার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার আগেই ও জায়গা ছেড়ে সরে পড়তে পারবে। নদী পার হয়ে যেতে পারবে। কিন্তু এখন আর সে সম্ভাবনা নেই।

সাড়া না পেয়ে লোকটার পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেছে কর্নেল, গান বোল্ট টানাটানির শব্দ শুনতে পেয়েছে ও। সামনেই বইতে থাকা নদীর দিকে তাকিয়ে আফসোস করল রানা। আরেকটু যেতে পারলেই ওটা পাড়ি দিয়ে বতসোয়ানায় পৌঁছানো যেত। কিন্তু এখনই তা আর সম্ভব নয়।

ওদিকে টোগো তার আগের অবস্থান থেকে সরে গেছে। পঞ্চাশ গজ উত্তরে কিছু বোল্ডারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে। তার সঙ্গী সার্জেন্টও রয়েছে একইরকম অবস্থানে, তবে একটু এগিয়ে। কর্নেল আর রানার মাঝামাঝি জায়গায়। সময় যত গড়াচ্ছে, ততই বাড়ছে কর্নেলের অস্বস্তি। কিছুই তার ইচ্ছেমত ঘটছে না।

সে জানে তার শত্রু খুব কাছেই গা ঢাকা দিয়ে আছে, প্রায় ধরে ফেলেছে সে তাকে, কিন্তু এদিকে নিজে ফক্কা হয়ে গেছে। এক মাথামোটা সার্জেন্ট ছাড়া দলের আর সবাই খতম হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে না, তাই ঘটেছে। নইলে এত ডাকাডাকির পরও আর কারও সাড়া নেই কেন? মাসুদ রানার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মাল তার। এত ঘৃণা জীবনে আর কাউকে করেনি। ওই মানুষটার জন্যেই ধ্বংস হয়ে গেল তার এত যত্নে গড়া সোনার ভবিষ্যৎ।

এতদিন ধরে আলেক্সেইর মাধ্যমে মস্কোর সাথে যে গোপন সমঝোতা সে গড়ে তুলেছিল, তার সব এখন ধরাছোঁয়ার অনেক বাইরে চলে গেছে। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এরকম লেজেগোবরে পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই মস্কো সাহায্য করবে না তাকে। যা-ও বা একটু ভরসা ছিল, আলেক্সেই ধরা পড়ে যাওয়ায় তারও বারোটা বেজে গেছে।

এখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ছাড়া কোন পথ খোলা নেই তার সামনে। এত স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা নিয়ে বাঁচতে চায় না টোগো। এ জন্যে যে দায়ী তাকেও বেঁচে থাকতে দিতে রাজি নয়। আর মরতে যদি হয়ই, ওটাকে নিয়েই মরবে একা নয়।

এবার এসো, ভাবল সে রানার সম্ভাব্য অবস্থানের দিকে তাকিয়ে। আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসো, হারামজাদা। ব্যাপারটার ইতি ঘটানো যাক। আজ এর শেষ হতেই হবে, তাছাড়া আর কোন বিকল্প উপায় নেই। এসো, তোমাকে ধাওয়া করতে করতে আমি ক্লান্ত

সঙ্গী সার্জেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে হাত নাড়ল কর্নেল, সামনের খানিকটা উন্মুক্ত জায়গা দেখাল লোকটাকে। তার নিশ্চিত ধারণা শত্রু ওই পথে আসবে। টোগো নিজে যদি লোকটার অবস্থানে থাকত, সে-ও তাই করত। তার নীরব

নির্দেশের জবাবে মাথা ঝাঁকাল সার্জেন্ট—বুঝতে পেরেছে।

অন্যদিকে রানাও মোটামুটি আন্দাজ করে নিয়েছে কর্নেলের অবস্থান সম্পর্কে। নদীর তীর ঘেঁষে যাওয়া মেঠো পথের এপারেই আছে লোকটা, ওর ডানদিকে। ধৈর্য হারিয়ো না, নিজেকে সতর্ক করল ও। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আর একটু পরই খেলা খতম হয়ে যাবে। এ সময়ে উল্টোপাল্টা কিছু করতে গিয়ে প্যাঁচ লাগিয়ে দিয়ো না।

লোকটা বড় নাছোড়বান্দা, ভাবছে ও। এতদূর পর্যন্ত কেন তেড়ে এল সে? যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামসহ প্রায় শ'দুয়েক মানুষ খুইয়েও কেন শিক্ষা হলো না? নাকি রুশ বন্ধুকে ছাড়া ফিরে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না বুঝতে পেরে নিরুপায় হয়ে অনুসরণ করছে ওকে? তাই যদি হয় তাহলে লোকটার উদ্দেশ্য একটাই, মাসুদ রানাকে খতম করা। তার উদ্দেশ্য যদি সফল হয়, তবু আসল লাভের খাতা শূন্যই থেকে যাবে, এটা জেনেও আসছে।

এক পা মত পিছাল ও, সিলেক্টর সুইচ ফুল অটোতে দিয়ে কাঁধে ঠেকাল রাইফেল, তারপর ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে নদীর তীর বরাবর বাঁ থেকে ডানে ব্রাশ ফায়ার করল। কাজ সেরে সটান শুয়ে পড়ে দ্রুত এক গড়ান দিয়ে চওড়া গুঁড়ির এক গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিল।

দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ হওয়ামাত্র ওদিকে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল সার্জেন্ট। উত্তেজনায় টান্ টান্ স্নায়ু ছিঁড়ে যাওয়ার অবস্থা তার, ট্রিগারে আঙুল রেখে কম করেও আধ ঘণ্টা ধরে অপেক্ষায় আছে, প্রতি মুহূর্ত চোখের সামনে নিজের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ দেখতে পাচ্ছে। এমন সময় গুলির শব্দ কিছুটা হলেও স্বস্তি এনে দিল তাকে। কেননা এতক্ষণে এমন একটা কিছু ঘটল যার পাল্টা প্রতিক্রিয়া সে দেখাতে পারে। যে-সব বোল্ডারের আশ্রয়ে আছে সে, তার একটায় একটামাত্র গুলি লেগেছে, তাতেই উদ্দেশ্য সফল হলো রানার।

ট্রিগারের ওপরে আঙুলটা অজান্তেই শক্ত হয়ে উঠল তার, চেপে এল প্রতিক্রিয়া দেখাল সে, একটু আগে যেখানে করডাইটের ধোঁয়া ও আগুনের ঝলক দেখা গেছে, সেদিকে একঝাঁক গুলি ছুঁড়ে বসল। ঝোপের মাথা উড়ে গেল বুলেটের তোড়ে, গাছের পাতা, ডাল উড়তে লাগল স্থানচ্যুত হয়ে।

ব্যাটার আহাম্মকি দেখে থ হয়ে গেল কর্নেল টোগো। রাগে দাঁতে দাঁত চাপল। করেছে কি হারামজাদা! এত সহজে নিজের অবস্থান ফাঁস করে দিল! এবার মরবে ব্যাটা। তাতে কোন সন্দেহ নেই তার। মরুক হারামজাদা, তাতে সুবিধেই হবে টোগোর। সার্জেন্টকে গুলি করলেই জানের শত্রুর সঠিক অবস্থান তার জানা হয়ে যাবে। তারপর...নদীতীরের ঢাল বেয়ে নিজেকে গড়িয়ে দিল সে, পানির কিনারায় গিয়ে নিঃশব্দে নেমে গেল গলাপানিতে।

সামনে প্রচুর বোল্ডার, গাছ ও ভাসমান গুঁড়ি রয়েছে তাকে আড়াল দেয়ার মত, কাজেই নিশ্চিন্ত মনে এগোল সে আহাম্মক সার্জেন্টের ঠিক পিছনে পৌঁছার জন্যে। 'দারুণ দেখিয়েছ, সার্জেন্ট,' ফিস্‌ফিস্ করে বলল সে। 'আমার বিশ্বাস ব্যাটাকে আহত করতে পেরেছ তুমি। শোনো, আমি আরেকটু এগিয়ে লোকটার

পিছনে যাওয়ার চেষ্টা করছি। তুমি ওখানেই থাকো, গুলি চালিয়ে যাও থেমে থেমে। বুঝতে পেরেছ?'

চোখ না সরিয়ে মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

'অলরাইট। একটু ধৈর্য ধরো, তাহলে ব্যাটাকে খতম করে আজই বাড়ি ফিরে যেতে পারব আমরা।'

আবার মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'বাড়ি ফিরে যেতে পারব' কথাটা যেন মধুবর্ষণ করেছে কানে। কিন্তু সে যেমন আশা করেছিল, বর্তমান অবস্থান থেকে তেমন একটা সরল না টোগো। দু'পা গিয়েই থেমে পড়ল, ফিরে এল আগের জায়গায়। অথচ পানিতে মৃদু শব্দ তুলে সার্জেন্টকে বোঝাতে চাইল সে যাচ্ছে। আসলে মনে মনে চাইছে রানা এগিয়ে এসে খতম করুক লোকটাকে, যাতে সে বাগে পায় ওকে।

সার্জেন্ট খতম হওয়ার পর যদি কিছু সময় নীরবে অপেক্ষা করতে পারে সে, তাহলেই কাজ হবে। তাকে খুঁজে বের করতে এগিয়ে আসবে রানা, তারপর…। অন্যদিকে ঘাড়ে-মাথায় ঝরা পাতা ও ছোট ছোট ডালের স্তূপ নিয়ে অনড় বসে আছে রানা। ডান চোখের কোণ দিয়ে একটামাত্র গান ফ্ল্যাশ দেখতে পেয়েছে ও, কয়েকটা বোল্ডারের আড়াল থেকে ছোঁড়া হয়েছে গুলি।

ওই পর্যন্তই। লোকটা কর্নেল টোগো কি না জানে না। নাকি আর কেউ? তাই হবে, কারণ এরকম মুহূর্তে গুলি ছুঁড়ে ওর ফাঁদে পা দেয়ার মত রামছাগল কর্নেল হতে পারে বলে রানার মনে হয় না। নিশ্চয়ই অন্য কেউ হবে লোকটা। আবার কর্নেল হতেও পারে। ঘুমের অভাব, নার্ভাসনেস, ক্লান্তি প্রভৃতি মানুষের মনে আজব সব প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে। লোকটা হয়তো তারই শিকার হয়ে কাজটা করে বসেছে।

চাপ বজায় রাখতে হবে, ঠিক করল রানা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নদী পার হতে হবে। গোলাগুলির শব্দ দু'দিকেরই বর্ডার গার্ডদের কানে গিয়ে থাকতে পারে। তাদের কেউ যদি ব্যাপার তদন্ত করে দেখতে আসে, ও-ই হয়তো সমস্যায় পড়ে যাবে। আফ্রিকান হয়ে আফ্রিকানদের সমর্থন-সহানুভূতি আদায় করে ওকে ফাঁসিয়ে দেয়া কর্নেল টোগোর জন্যে সহজ।

রাইফেল রিলোড করে নিল রানা। বুকে হেঁটে পিছাতে লাগল। বনের প্রান্তে চওড়া রেখার মত লালচে মাটি দেখে সেদিকে এগোল, নদীর তীর ধরে গেছে ওটা। কিন্তু ওখানে পৌঁছতে হলে খানিকটা খোলা জায়গা পেরোতে হবে। তার ওপাশে সেই বোল্ডার, যেখানে গা ঢাকা দিয়ে আছে সার্জেন্ট।

দূরত্বটুকু অনুমান করে নিল ও–চল্লিশ গজের মত হবে। খুব বেশি নয়। মরিয়া হয়ে চেষ্টা করলে পেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে না ওর পক্ষে, কিন্তু আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকা লোকটার হাত যদি পাকা হয়, অর্ধেক পথ যাওয়ার আগেই ওকে ঝাঁঝরা করে দিতে পারবে। কাজেই সে ঝুঁকি না নেয়ারই সিদ্ধান্ত নিল, ব্যাটাকে আড়াল থেকে বের করার উপায় খুঁজতে লাগল।

একটু মাথা খাটাতেই পাওয়া গেল লোকটাকে কয়েক মুহূর্ত মাথা গুঁজে

পড়ে থাকতে বাধ্য করে যদি দৌড়ে নদীর তীরে পৌছতে পারে রানা, তাহলে কাজ হবে। একদম লোকটার পিছনে অবস্থান নিতে পারবে। বেশকিছু বোল্ডার, গাছ, ভাসমান গুঁড়ি আছে, ওগুলোর আড়ালে যেতে পারলে...। অপেক্ষা করতে লাগল ও।

নজর ঘুরছে ডান থেকে বাঁয়ে, খুব ধীরে ধীরে। যা-ই দেখছে, মনের পর্দায় তার ছায়া গেঁথে রাখছে। পিঠ থেকে প্যাক খুলে পাশে রাখল ও, ভেতরে হাত ভরে কিছু খুঁজতে লাগল। পাওয়া গেল জিনিসটা, একটা গ্রেনেড প্যাক জায়গায় রেখে ওটার পিন খুলল রানা, ডান হাত পিছনে নিয়ে পিঠের মাসলের ওপর নির্ভর করে গায়ের জোরে ছুঁড়ে দিল বোল্ডারগুলোর দিকে।

জানে ওটা অর্ধেক দূরত্বও অতিক্রম করতে পারবে না, এবং সেটা ও আশাও করছে না। গ্রেনেড উত্থানের শিখরে পৌছতে উঠে দাঁড়াল রানা, বন থেকে বেরিয়ে নদীর তীরের দিকে এগোল, একইসঙ্গে সার্জেন্টের অবস্থান লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করল। মুখে অজস্র গ্র্যানিট স্প্লিন্টার আঘাত করতে চেহারা বিকৃত করল সার্জেন্ট।

গুলি থেমে যেতে বুঝল এবার তার পালা। ঝট্ করে আড়াল থেকে মুখ বের করল সে, ততক্ষণে নিজেকে মাটিতে গড়িয়ে দিয়েছে রানা। ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়াল সার্জেন্ট, ঠিক তখনই তার বিশ ফুট সামনে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। আওয়াজটা এমন চমকে দিল/তাকে যে দ্রুত অস্ত্র তুলতে গিয়ে নিজের চোখে রিয়ারসাইট দিয়ে ভয়ঙ্কর এক খোঁচা মেরে বসল ঝপ্ করে বসে পড়ল সে। অস্ত্র ছেড়ে চেপে ধরল চোখ।

রানার ব্রাশের আওয়াজে ঘাবড়ে গিয়ে মাথা নিচু করে ফেলেছিল টোগো, কিন্তু যখন বুঝল গুলির লক্ষ্য সে নয়, তখন উঁচু হয়ে অস্ত্র তুলল। কিন্তু ঠিকমত অ্যাঙ্গেল না পেয়ে অভিসম্পাত দিল নিজেকে। ওদিকে ধুপ-ধাপ্ পায়ের শব্দে এক চোখে সামনে তাকাল সার্জেন্ট, রানাকে তার দিকে ছুটে আসতে দেখে আত্মা উড়ে গেল।

উপায় নেই দেখে এরকম মুহূর্তে যা একমাত্র করণীয়, তাই করল দু'হাত মাথার ওপর তুলে সটান দাঁড়িয়ে গেল। আড়াল ছেড়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। এক চোখ বন্ধ। পানি গড়াচ্ছে গাল বেয়ে। তার পিছন থেকে মনে মনে হায় হায় করে উঠল টোগো। ব্যাটা দাঁড়াবি তো দাঁড়া, একদম তার লাইন অভ ফায়ারে! লোকটা না সরা পর্যন্ত গুলি ছুঁড়তে পারছে না সে

দাঁতে দাঁত চেপে তাকে জঘন্য একটা গাল দিল কর্নেল; এ ক্ষেত্রে যা করণীয়, তাকেও তাই করতে হলো বাধ্য হয়ে। লোকটার পিঠ সই করে পরপর পাঁচটা গুলি করল। তামার নাকওয়ালা বুলেটে ছিঁড়েখুঁড়ে হাঁ হয়ে গেল তার ঊর্ধ্বাঙ্গ। পঞ্চম গুলিটা ওর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে রানার জি-থ্রী রাইফেলের স্টকে আঘাত করল। মুঠো থেকে উড়ে বেরিয়ে গেল ওটা

প্রচণ্ড এক ঝাঁকিতে মুহূর্তের মধ্যে ডান হাত অবশ হয়ে গেল রানার, নতুন বিপদ দেখতে পেয়ে ডাইভ দিয়ে বোল্ডারের আড়াল নিল ও। সময় নষ্ট না করে দ্রুত এগোল, মৃত সার্জেন্টের অটোম্যাটিকটা তুলে নিল এক ঝটকায়। টানা ব্রাশ

ফায়ার করল টোগো, বোল্ডারে লেগে দিগ্বিদিক্ ছুটে গেল বুলেটগুলো। ম্যাগাজিন ফুরিয়ে যেতে ওটা রিলিজ করে রিলোড করল ব্যস্ত হাতে।

রানা নতুন অস্ত্র চেক করল। ফুল ক্লিপ! ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ও। সার্জেন্টের দেহ থেকে আরেকটা ক্লিপ খুলে নিতে পারলে ভাল হত, কিন্তু মারাত্মক ঝুঁকি আছে বলে সে চিন্তা বাদ দিল। প্যাক খুলে শেষ দুটো গ্রেনেড বের করল ও ব্যস্ত হাতে। ভাবল, একবার যখন কাজ হয়েছে, আবারও হতে পারে। পিস্তল বের করে একটা গুলি চেম্বারে এনে আবার জায়গায় রেখে দিল ওটা।

কালাশনিকভ কোনাকুনি কাঁধে ঝুলিয়ে গ্রেনেড দুটো তুলে নিল, দাঁত দিয়ে পিন খুলে নিয়ে ধরে রাখল দুই মুঠোয়।

কি ঘটতে যাচ্ছে দেখার জন্যে গলা টান করেছিল টোগো, তখনই বোল্ডারের আড়াল থেকে একটা গ্রেনেড উড়ে আসছে দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেল। ঝপ্ করে মাথাটা পানির নিচে টেনে নিল সে। পানিতেই পড়ল ধাতব ডিমটা, তবে তার থেকে পনেরো ফুট দূরে। বিস্ফোরণের ধাক্কা প্রায় পুরোটাই শুষে নিল জাম্বিজি, কিন্তু তারপরও যে সামান্য ধাক্কা লাগল, তাতেই দু'কানে ঘণ্টী বাজতে শুরু করল কর্নেলের।

এই সুযোগে রানা ঝেড়ে দৌড় লাগাল নদীর দিকে। প্রায় শুকনো নদী, তার ওপর পানিও হাঁটু সমান। ছপাৎ-ছপাৎ আওয়াজ তুলে মাঝনদীতে পৌঁছল, ঠিক সেই মুহূর্তে মাথা তুলল টোগো। মাথা ঝাড়া দিয়ে চোখের ওপর থেকে পানি সরিয়ে তাকাতেই ছুটন্ত রানাকে দেখতে পেয়ে হুড়োহুড়ি করে অস্ত্র তুলতে গেল, কিন্তু লাভ হলো না।

হিসেব টনটনে ছিল রানার, সময় বুঝে দ্বিতীয় গ্রেনেডটাও ছুঁড়ে দিল। আঁতকে উঠে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আবার ডুব দিল লোকটা, দু'হাতের ভাঁজে চোখমুখ আড়াল করল। তার আট ফুটের মধ্যে পড়ে ফাটল গ্রেনেড। নাক দিয়ে গল্‌গল্ করে রক্ত বেরিয়ে এল কর্নেলের, স্প্লিন্টারের আঘাতে ওপরের ঠোঁট ছিঁড়ে হাঁ হয়ে গেল। আঘাতের চোট সামলে মাথা তুলতে আট-দশ সেকেন্ড লেগে গেল কর্নেলের, ততক্ষণে, প্রায় পগার পার হয়ে গেছে ও। বতসোয়ানার অংশে পৌঁছে গেছে, এখন শুধু ঢাল বেয়ে উঠে ঝোপঝাড়ের আড়ালে যেতে পারলেই হলো।

অসহ্য রাগে কুকুরের মত গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল কর্নেল, কালাশনিকভের স্টক নিতম্বের পাশে ঠেকিয়ে গুলি করল। লাইন ধরে রানার পিছন পিছন উঠে যাচ্ছে বুলেট, এই ধরল! কিন্তু না! হ্যামার শূন্য চেম্বারে পড়ে বুঝিয়ে দিল ফুরিয়ে গেছে গুলি। শিকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে আতঙ্কিত হয়ে দ্রুত রিলোড করতে চাইল টোগো, কিন্তু হতচ্ছাড়া আঙুলগুলো মস্তিষ্কের নির্দেশ পালন করতে মহামূল্যবান কয়েক মুহূর্ত সময় নষ্ট করে ফেলল। ততক্ষণে চোখের আড়ালে চলে গেছে রানা।

আড়ালে এসে একটা গাছের পিছনে দাঁড়াল রানা, একে-র সাইটে চোখ রেখে খুঁজে বের করল কর্নেলকে। ভেবেছিল আর আসবে না লোকটা। খেলা শেষ, কাজেই অর্থহীন দৌড়-ঝাঁপ বন্ধ করে ফিরে যাবে। কিন্তু কিসের কি! পিছু ছাড়েনি

এখনও ম্যানিয়াকটা। নদী পাড়ি দিচ্ছে। নাক, মুখ ও কান দিয়ে রক্ত ঝরছে অনবরত, সেটাকে আমলই দিচ্ছে না। তার চাউনি দেখে রানা বুঝল পাগল হওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে লোকটা।

যেন ওর অনুমানের সত্যতা প্রমাণ করতেই ঝট্ করে অস্ত্র কাঁধে তুলল কর্নেল, ওর উদ্দেশে আন্দাজে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ল।

আড়াল থেকে চেঁচিয়ে বলল রানা, 'কর্নেল! ফিরে যাও। এখন আর কিছু করার নেই তোমার। আমি তোমার মুঠো থেকে বেরিয়ে এসেছি।'

এপারের তীরের কাছে থেমে দাঁড়াল লোকটা, মুখ তুলে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। 'ভুল!' সে-ও পাল্টা চেঁচাল। 'আমার মুঠো থেকে জীবনে বের হতে পারবে না তুমি।'

'পাগলের মত কথা বোলো না!' ধমকের সুরে বলল ও। 'আমি আরেক দেশের সীমানায় দাঁড়িয়ে আছি। এপারে এলে এদেশের বর্ডার গার্ডরা তোমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। চলে যাও।'

এবারের জবাব মুখে দিল না লোকটা, দিল অটোম্যাটিক দিয়ে। একনাগাড়ে পাঁচ-ছয়টা গুলি করল থেমে থেমে। এবার অনেক কাছে এসে পড়ল বুলেটগুলো।

'তুমি আমার সাইটে রয়েছ, কর্নেল!' এবার হুমকি দিল রানা। 'আর এগোলে কিন্তু সত্যি গুলি করব আমি।'

সশব্দে হেসে উঠল লোকটা। 'বি মাই গেস্ট, ম্যান! করো!' পানি ছেড়ে তীরে উঠল, আরও তিনটে গুলি করল।

'ব্যাটা পাগল হয়ে গেছে,' নিজেকেই বলল রানা। পাগলকে যত সাঁকো নাড়াতে নিষেধ করা হবে, সে তত নাড়াবে। ওয়াকওভার পেলে হয়তো খুশি হবে বজ্জাত ব্যাটা। এখন সটকে পড়াই ভাল।

দশ

রূপা ও সুমন্ত মিলিটারি এয়ারফিল্ডে পৌঁছতে ওদের সাথে দেখা করতে এল মেজর ফরবস্। মাথার ওপর ঝকঝকে নীল আকাশ, মেঘের চিহ্নও নেই কোথাও। তেমন গরম নেই, মোটামুটি সহনীয় পরিবেশ।

মুখের সামনে থেকে বিরক্তিকর একটা মাছি তাড়াল মেজর হাতের ঝাপ্টায়। 'একটা খবর আছে আপনাদের জন্যে।'

'মেজর রানার কোন খবর?' ব্যস্ত কণ্ঠে বলল রূপা।

জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলেও বুজে ফেলল ফরবস্। একটা সি-১১৯ ল্যান্ড করল রানওয়ের বাঁ প্রান্তে, বিকট শব্দ করছে ওটা।

ওদের কাছে এসে দাঁড়াল সে, গলা চড়িয়ে বলল, 'না, মেজরকে এখনও ট্রেস করতে পারিনি আমরা। তবে খবর এসেছে, জাম্বিজি ক্রসিঙে আজ সকালে

অনেকক্ষণ গোলাগুলি হয়েছে। বলা হয়েছে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে ওখানে, পরে তাদের সবাইকে মৃত পাওয়া গেছে। এন.এফ.এল.কে ইউনিফর্ম পরা ছিল প্রত্যেকে। আরও বিস্তারিত খবরের আশায় আছি আমরা। আপনাদেরকে এখানে ডেকেছি যদি মেজরের খোঁজ জানা যায়, সঙ্গে সঙ্গে পিক-আপ করতে যাব আমি চাইলে আপনারাও যেতে পারেন।'

'চাই মানে?' উত্তেজিত হয়ে উঠল সুমন্ত। 'নিশ্চই চাই! কিন্তু সে জন্যে অপেক্ষা করার দরকার কি? একটা প্লেন নিয়ে এখনই তো যেতে পারি আমরা।'

মাথা নাড়ল মেজর। 'তা সম্ভব নয়। কারণ সেটা পণ্ডশ্রমও হতে পারে। কাজেই অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তাছাড়া সকালের ঘটনাটা তারাই ঘটিয়েছে কি না, সে ব্যাপারেও নিশ্চিত নই আমরা।'

'আমরা নিশ্চিত,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রূপা। 'এ কাজ ওদের ছাড়া আর কারও হতে পারে না। তবে অনর্থক উড়ে বেড়ানোরও কোন যুক্তি দেখি না আমি। তারচেয়ে বরং এরমধ্যে হ্যানস ল্যাংসডর্ফের শেষকৃত্য সেরে আসি আমরা।'

দেহের ভার এক পা থেকে অন্য পায়ে চাপাল মেজর। মনে হলো অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। একটু যেন লজ্জাও পেয়েছে। 'ও, হ্যাঁ। আমিও যেতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু ইউ নো, আমার এখানে থাকা উচিত। জাস্ট ইন কেস। আপনারা যান, আমার ড্রাইভার পৌঁছে দিয়ে আসবে আপনাদেরকে। ওখানে আমার লোক আছে।'

একটু পর মেজরের বেন্টলিতে চড়ে ভিক্টোরিয়া মিলিটারি সিমেটারির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল রূপা ও সুমন্ত। পথে একটা কথাও বলল না কেউ, যে-যার চিন্তায় মগ্ন। মৃত্যুর আগে ল্যাংসডর্ফ নিজেই তাকে এদেশে সমাহিত করার অনুরোধ জানিয়ে গেছে, যাতে অন্য সব মৃত সঙ্গীর সাথে থাকতে পারে সে। ইচ্ছে পূরণ করা হয়েছে মানুষটার

সিমেটারিতে পৌঁছতে ফরবসের একজন প্রতিনিধি, এক ক্যাপ্টেন ও জর্জ অভ্যর্থনা জানাল ওদেরকে। অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্যে কোন চ্যাপলেন নেই, ডাকা হয়নি। ফরবসের প্রতিনিধি ক্যাপ্টেনকে দেয়া হয়েছে দায়িত্বটা। সে ও হ্যানসের সহযোদ্ধারা কফিনের কাছাকাছি দাঁড়াল, রূপা সামান্য দূরে।

অন্যদিকে আছে বর্ডার স্কাউটদের ছোটখাট একটা দল, সবার হাতে এফএন রাইফেল প্রস্তুত। গুলি ছুঁড়ে ল্যাংসডর্ফকে শেষ অভিবাদন জানাবে তারা। মাথা থেকে গ্যারিসন ক্যাপ খুলে নিল ক্যাপ্টেন, গলা খাঁকারি দিয়ে যথার্থ শব্দ খুঁজতে লাগল।

'আমি জানি, অভিজ্ঞ কেউ এখানে থাকলে মৃতের শেষকৃত্য উপযুক্ত বাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারত। কিন্তু তেমন কেউ যখন নেই, আমার দ্বারা যতটা সম্ভব আমি করব। মৃতকে আমি চিনি না, অথচ তবু মনে হচ্ছে সে যেন আমার কতদিনের চেনা, কত আপন।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে আবার শুরু করল সে। 'হ্যানস ল্যাংসডর্ফ সৈনিক ছিল। এখানে আমরা যারা রয়েছি, তারাও সবাই সৈনিক। বিভিন্ন দেশের এবং

সংস্কৃতির, আলাদা আলাদা ধর্ম ও বিশ্বাসের হলেও আমরা সৈনিক, সেটাই আমাদের বড় পরিচয়। কাজেই এক সৈনিককে সমাহিত করতে, তাকে তার মৃত্যু পরবর্তী জীবনের পথে যাত্রা করিয়ে দিতে আমাদের সমাবেশই যথোপযুক্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি। যদিও জানি না সে পরকালে বিশ্বাস করত কি করত না। তবু তাকে আমরা সম্মান জানাচ্ছি, নিজেদেরকে সম্মানিত করার জন্যে।'

নিচু দিয়ে ডানার সাঁই-সাঁই আওয়াজ তুলে বড় এক ঝাঁক গোলাপী বক উড়ে গেল পশ্চিম দিকে। বাসা তৈরির জায়গা ও খাদ্যের খোঁজে ওকাভাঙ্গো জলাভূমির দিকে যাচ্ছে ওগুলো।

'আমি বিশ্বাস করি মৃতের সাথে যদি আরও আগে আমার পরিচয় ঘটার সুযোগ হত, তাহলে মানুষটাকে নিঃসন্দেহে আমার ভাল লাগত। কারণ তার সহকর্মীদের মুখে আমি জেনেছি, মানুষ হিসেবে সে কঠিন ছিল, কিন্তু নিষ্ঠুর ছিল না। যোদ্ধা ছিল, কিন্তু আপন সন্তুষ্টির জন্যে হত্যা করেনি সে কোনদিনও। তার দেশে ভ্যালহ্যালা সম্পর্কে এক চালু উপকথায় আছে, মৃত্যুর পর বীর সৈনিকদের সেখানকার স্বর্গ, গ্রেট হল ওডিনে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে অনন্তকাল ধরে আনন্দ-উৎসব করবে তারা, অনন্তকাল লড়াই করবে। আমার মনে হয় এই মৃত বীরকে সেই স্বর্গেই জায়গা দেয়া হবে। আমরাও সেই প্রার্থনাই করছি।

'আমাদের সবার তরফ থেকে তার মাতৃভাষাতেই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানছি আমি। ইক হ্যাট এইন কামেরাডেল, বেসের্ন ফিন্ডস্ট ডু নিখট—এক সময় এক সহযোদ্ধা ছিল আমার, তারচেয়ে ভাল কাউকে খুঁজে পাবে না তুমি।'

ক্যাপ্টেনের নীরব ইঙ্গিতে আকাশের দিকে অস্ত্র তাক করল অনার গার্ড, একযোগে গর্জে উঠল সবগুলো। পাহাড়ের গায়ে আঘাত খেয়ে বিকট প্রতিধ্বনি তুলল সে গর্জন। এরপর ধীরেধীরে কবরে নামানো হলো হ্যানসের কফিন।

সহযোদ্ধাদের চোখের কোণ সিরসির করছে, অনেক কষ্টে কান্না ঠেকিয়ে রেখেছে তারা। কারণ জানে, ঠিক এভাবেই নিজের মৃত্যু কামনা করত মানুষটা, সব সময়। কাজেই এ সময় কাঁদলে হ্যানসকে অপমানই করা হবে।

আরেকদল বক উড়ে গেল পশ্চিমে।

মুখের ভেতরটা শুকিয়ে খট্‌খট্‌ করছে রানার, টাক্‌রার সাথে জিভের সংযোগ ঘটলেই জঘন্য একটা স্বাদ অনুভব করছে।

জাম্বিজি ক্রসিং থেকে ছয় মাইল সরে এসেছে ও, এরমধ্যে টোগোর কোন সাড়া পায়নি। লোকটা এখন কোথায়, তাই নিয়ে গবেষণা করছে রানা। কাছেপিঠেই যে আছে, তাতে কোন সন্দেহই নেই। এ-লোক সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়, বোঝা হয়ে গেছে ওর।

প্রথম এক ঘণ্টা নিজের ফেলে আসা ট্র্যাক যত্নের সাথে মুছে এগিয়েছে রানা. তারপর ছেড়ে দিয়েছে। ভেবেছে, এত প্রচেষ্টার পরও যদি লোকটা ওকে খুঁজে বের করতে পারে তো পারুকগে। ট্র্যাক লুকোবার চেষ্টা বাদ দিয়ে বরং দ্রুত চলাই উচিত। রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে দীর্ঘ পায়ে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে ও। চারদিকে

কোমর সমান হলুদ ঘাস। সিংহ চরে বেড়াচ্ছে তার মধ্যে, থেকে থেকে শিকারও করছে, তবে ওর ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

ভেবেচিন্তে হাঁটার পুরানো এক পদ্ধতি অনুসরণ করল ও। মনে মনে দেহ থেকে আলাদা করে নিল নিজেকে। ভাবতে লাগল, ও হাঁটছে না। হাঁটছে অন্য কেউ, ও দূর থেকে তাকে দেখছে কেবল চমৎকার কাজ হলো তাতে। একটুও কষ্ট হচ্ছে না আর। কল্পনার চোখে উঁচু থেকে অচেনা এক লোককে দেখতে পাচ্ছে ও, হলদে সমতলভূমি ধরে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

একেবারে পথের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকা অথবা চলন্ত সাপ দেখেও দিক বদলাল না। ওসব আসলে কল্পনা, বাস্তবে নেই। দলবদ্ধ সিংহ বা হরিণের ঝাঁক অথবা জেব্রা, হায়েনা, ওসবও নেই।

এইভাবে কতক্ষণ ছুটেছে বলতে পারবে না রানা। হুঁশ ছিল না। হুঁশ হলো মাটিতে আছড়ে পড়ে। একেবারে ষষ্ঠাঙ্গে পতন হলো ওর। মাটির ওপর কোনমতে মুখটা কেবল তুলে রাখল। বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা পড়ছে, দম ফেলছে ঝড়ের বেগে। প্রতি নিঃশ্বাসে ধুলো উড়ছে।

ধাতস্থ হতে অনেকক্ষণ লাগল। একটু একটু করে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ফিরে পেল দেহ। নিঃশ্বাস ধীরে, নিয়মিত হয়ে এল। স্বাভাবিক হলো বুকের স্পন্দন। কিছু ছায়া গায়ের ওপর দিয়ে ছুটে গেল দেখে মুখ তুলল রানা। এক ঝাঁক গোলাপী বক উড়ে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে। পড়ে থাকা দেহটার প্রতি কোন আগ্রহ নেই ওদের।

উঠে বসল রানা। চোখের সামনে হাত তুলে সূর্য আড়াল করে সামনে তাকাল। উত্তাপের অদৃশ্য, কাঁপা কাঁপা ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে অনেক দূরে গভীর বন দেখতে পেল। ওকে ডাকছে যেন, তার শীতল ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নিতে আহ্বান জানাচ্ছে।

কিন্তু কোনরকম আগ্রহ দেখাল না রানা। কারণ জানে, ওটা আর কিছু নয়, মরীচিকা। মরুভূমিতে ওরকম অনেক কিছুই দেখা যায়। পথভোলা পথিককে পথ হারাতে সাহায্য করে ওসব ভুয়া দৃশ্য।

জাম্বিজি ক্রসিং পেরিয়ে এসে বর্ডার পেট্রলের নজর এড়িয়ে জিম্বাবুইয়ে ঢুকে পড়ল কর্নেল টোগো, দৌড়ে এগোতে শুরু করল।

এখন একা সে। সঙ্গীদের সবাই খতম। শেষজনকে সে নিজের হাতে যমের বাড়ি পাঠিয়েছে। শত্রু ভয়ঙ্কর, কিন্তু তাতে ঘাবড়াবার পাত্র নয় সে। একজন কেন, ওরকম এক হালিকেও পরোয়া করে না টোগো।

দৌড়ের ওপর গায়ের সমস্ত পরিধেয় খুলে ফেলল সে। ইউনিফর্ম শার্ট, ট্রাউজার্স, বুট, মোজা, সব ছুঁড়ে ফেলে দিল। কেবল কালো রঙের স্কিন টাইট শর্টসটা থাকল। ওটা কালো হওয়ায় সুবিধে হয়েছে, গায়ের রঙের সাথে এমনভাবে মিশে আছে, মনেই হয় না পরনে কিছু আছে। সব খুলে দেহটাকে মুক্তভাবে দম নেয়ার স্বাধীনতা দিল কর্নেল, প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে যেতে দিল।

হাতের কালাশনিকভ একে-৪৭ মাটিতে রেখে উঁচু এক উই ঢিবির ওপর উঠে চারদিকে নজর বোলাতে লাগল। পশ্চিমা সংস্কৃতির ধারক ধড়াচুড়া ছাড়তে পেরে নিজেকে সব ধরনের বন্ধনমুক্ত মনে হলো তার। সে বোঝে পিছনে ফিরে যাওয়ার কোন পথ নেই। এতদিন যেজন্যে নিজেকে ঘষেমেজে প্রস্তুত করেছিল, তার সব বরবাদ হয়ে গেছে। শ্রমের ফসল ঘরে তুলতে পারছে না সে।

কিন্তু তা নিয়ে এখন আর ভাবছে না, ভাবছে যে মানুষটা এর জন্যে দায়ী, কেবল তার কথা। পুরো এক চক্কর ঘুরে এল কর্নেলের দৃষ্টি। থামল এক জায়গায়। শত্রুর পায়ের ছাপ দেখতে পেয়ে কঠিন হাসি হাসল। মুহূর্তে তার মন ও আত্মাও আদিম কালে ফিরে গেল। এখন তার সবকিছুই আদিম, কেবল হাতের অস্ত্রটা ছাড়া। ওটা পশ্চিমা, আধুনিক। এই শতাব্দীর।

কিন্তু সে চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দিল টোগো, নিজেকে আদিম শিকারী ভাবতে লাগল। কাজে নেমে কাজ উদ্ধার না করে থামত না তারা। মৃত্যু হলেও না। সে-ও থামবে না। জোরে জোরে নাক টেনে শত্রুর গতিবিধি বুঝে নিল লোকটা, বুঝল সঠিক পথেই আছে। নেমে এসে রাইফেল তুলে নিয়ে দৌড় শুরু করল সে।

পথে বেশ কয়েকজন স্থানীয় রাখালের সাথে দেখা হলো, ছাগল অথবা গরুর পালকে পানি খাওয়াতে নিয়ে চলেছে। তার চকচকে দৃষ্টির অর্থ ধরতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল লোকগুলো, আপন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করল না টোগো, কারণ জানে সঠিক পথেই যাচ্ছে সে।

আকাশের দিকে তাকাল। সামনে, অনেক দূরের এক সবুজ প্রান্তরে নেমে পড়ার আয়োজন করতে দেখল গোলাপী বকের একটা ঝাঁককে। ওকাভাঙ্গো জলাভূমি ওটা। ওদের জন্যে প্রচুর খাবার আছে ওখানকার পানিতে। ওদিকে থাকতে পারে না শিকার। নজর ঘোরাল কর্নেল, হলুদ ঘাসে ভরা সমতল ভূমির দিকে তাকাল। প্রতিটি ইঞ্চিতে খুঁজতে লাগল তন্ন তন্ন করে।

ওই যে! উত্তেজিত হয়ে উঠল সে, ওই যে যাচ্ছে শয়তান! নির্দয় হাসি ফুটল তার মুখে। অনেক দূরে, ছোট্ট, একটা মাজাভাঙা আলপিনের মত দেখা যাচ্ছে তাকে। তাকেই যে সে খুঁজছে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না মনে। আবার ছুটল। ঘৃণায় চোখ কুঁচকে হাতের কদর্য রাইফেলটা দেখল এক পলক। ইশ্, এর বদলে যদি একটা অ্যাসেগাই থাকত হাতে, ভাবল সে, অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত।

ওটা শত্রুর বুকে বিঁধিয়ে দিয়ে তার রক্তে বর্শাটা ভিজিয়ে নিতে পারলে অনেক ভাল লাগত। অন্যরকম একটা মজা পাওয়া যেত।

•

জিম্বাবুইয়ান বর্ডার আর কতদূর? ভাবল মাসুদ রানা। শার্টের আস্তিনে কপাল, মুখের ঘাম মুছে সামনে তাকাল। ম্যাপ দেখলে মনে হয় যেন এই তো, এসে পড়েছে। অথচ বাস্তবে ব্যাপারটা একেবারেই উল্টো।

গরম অসহ্য হয়ে উঠেছে, শার্ট ভিজে সেঁটে গেছে গায়ের সাথে অস্বস্তি লাগছে। ওটা খুলে কোমরে হালকা এক প্যাঁচ দিয়ে বেঁধে নিল ও। লম্বা করে দম নিল কয়েকবার, ছাড়ল ধীরে ধীরে। এভাবে কিছুক্ষণের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনল। অসহ্য খিদেয় জ্বলছে পেট। বিষয়টা ভুলে থাকার চেষ্টা করল ও, কিন্তু কাজ হলো না। মনে হচ্ছে নাড়িভুঁড়ি সব হজম হয়ে যেতে আরম্ভ করেছে ভেতরে। আর কতদূর?

ওর ধারণা, যে গতিতে ও এগোচ্ছে তাতে বর্ডারে পৌঁছতে দু'দিন, এমনকি তিনদিনও লেগে যেতে পারে।

সামনে তাকাল রানা। ঘন বন। মরীচিকা নয়, সত্যি। প্রচুর বড় বড়, পুরানো গাছ। ওখানে আশ্রয় নিতে হবে রাতের মত। কারণ অন্ধকারে চলা যাবে না। তাতে পথ হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা আছে। কিন্তু খিদে…চোখমুখ কুঁচকে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল ও। খাওয়ার মত একটা কিছু যদি পাওয়া যেত!

বনটার দিকে এগোল রানা। যখন ভেতরে ঢুকল, তখনও বেশ আলো আছে। খানিক পরেই বনের প্রান্তে এসে দাঁড়াল কর্নেল টোগো।

ততক্ষণে আরও ঘন হয়েছে আঁধার। কিন্তু আদিম টোগোর জন্যে সেটা কোন সমস্যা হলো না। ওর পায়ের ছাপ ঠিকই খুঁজে বের করল সে।

এগারো

রূপা আর সুমন্ত প্রায় সারাদিনই এয়ারপোর্টে কাটাল। শেডিউল অনুযায়ী কিছু প্লেন এল, কন্ট্রোলাররা ওগুলোকে অ্যাপ্রোচ ও টেক-অফ করার গৎ বাঁধা নির্দেশ দিয়ে যেতে থাকল। দুপুর পর্যন্ত এভাবেই চলল। এদিকে সময় যত গড়াচ্ছে, রূপার অস্থিরতাও বাড়ছে ততই। দুপুরের একটু পর মেজর ম্যাট ফরবস্ এসে যোগ দিল ওদের সাথে। এখনও কোন খবর আসেনি শুনে চিন্তিত হয়ে পড়ল।

এর ঘণ্টাখানেক পরই কনফার্মেশন এল। অপেক্ষমাণ দলটাকে জানানো হলো, ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম পরা একজনকে দেখা যাওয়ার খবর সত্যি। বর্ডার ক্রসিঙের কাছে দেখা গেছে তাকে। রূপা-সুমন্তর উদ্বেগাকুল, টান্-টান্ স্নায়ুতে ঢিল পড়ল। পরম স্বস্তির স্নিগ্ধ একটা ধারা দোলা দিয়ে গেল। বাষ্প জমল 'কঠোর হৃদয়' বলে খ্যাত রূপার চোখের কোণে। অন্যদের আড়াল করে চোখ মুছতে চাইল ও, কিন্তু ধরা পড়ে গেল সুমন্তর কাছে।

কাটাবার চেষ্টা করেছিল চোখে বালি ঢুকেছে বলে, কিন্তু কাজ হয়নি। ওর নাকের ডগায় লালের আভাস দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সুমন্ত।

ওদিকে কনফার্মেশনের সাথে চিন্তারও খোরাক ছিল কিছুটা। তা হলো, প্রথম জনের পিছন পিছন এক আফ্রিকানও বর্ডার ক্রস করে বতসোয়ানায় ঢুকেছে। অবশ্য তা নিয়ে কেউই খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছে না। সবাই বোঝে, এতদূর যখন

আসতে পেরেছে রানা, তখন বাকিটুকুও পারবে।

যে লোকটা ওকে তাড়া করছে, সে নিজের সম্পর্কে যতখানি আত্মবিশ্বাসী, তার অর্ধেকও যদি স্মার্ট হত, তাহলে অনেক আগেই ফিরে যেত।

'ব্যাটা আস্ত পাগল,' মন্তব্য করল সুমন্ত 'শুধু শুধু নিজের মরণ ডেকে আনছে।'

'পাগল কেন?' প্রশ্ন করল মেজর ফরবস।

'মাসুদ রানাকে এভাবে চেজ করা পাগল ছাড়া কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের কাজ নয়। এতদিন তাড়া করে ব্যাটার এই বোধোদয়টুকু অন্তত হওয়া উচিত ছিল।'

আর কিছু বলল না মেজর। ভাবল, হয়তো সত্যি কথাই বলেছে লোকটা। হয়তো নয়, একদম খাঁটি কথাই বলেছে। যে মানুষটা একদম 'নেই' থেকে মাত্র কয়েকদিনে এতকিছু করে বসতে পারে, তার পক্ষে আরও অনেক কিছুই সম্ভব। পরিবেশ তরল করার জন্যে রূপার দিকে ফিরে হাসল সে। 'তাহলে ধাওয়াকারীর শেষকৃত্য এখনই মুখে মুখে সেরে রাখতে পারি আমরা, কি বলেন?'

মাথা নাড়ল রূপা, সামনে ঝুলে থাকা একগোছা চুল কানের পিছনে গুঁজে বলল, 'তা পারেন। আমি সেরে ফেলেছি।'

'আমিও,' বলল সুমন্ত।

সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা পর টেলিফোন ধরার জন্যে মেজরকে ডাকা হলো। রূপা তীক্ষ্ণ নজর রাখল লোকটার ওপর, তার চেহারার ভাষা পড়ার চেষ্টা করল, যদিও তেমন কিছু বুঝল না। একটু পর রিসিভার রেখে ঘুরে দাঁড়াল মেজর, মুখে চওড়া হাসি। 'পাওয়া গেছে।'

দ্রুত তার দিকে এগোল রূপা। 'কোথায়?'

'কিছু ট্রাইবস্‌ম্যান তাকে পুবদিকে যেতে দেখেছে আজ। বর্ডারের খুব কাছে। মনে হয় কাল কোন এক সময়ে জিম্বাবুইয়ে ঢুকবে।'

রূপা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলল মেজর। 'তার পিছনে সেই আফ্রিকানও আছে। রাইফেল আছে লোকটার সাথে।'

হাসি ফুটল সুমন্তর মুখে। 'সেটা তার দুর্ভাগ্য।'

'এখন কি করব আমরা?' রূপা বলল।

'ওকে খুঁজে বের করতে যাব। ফ্রন্টিয়ারের কাছে আমাদের জন্যে কপ্টার রেডি আছে, সকাল হলে ওটা নিয়ে রওনা হব।'

অন্ধকারের রাজত্ব পুরোপুরি কায়েম হতে থেমে পড়ল রানা। রাতটা নিচেই কাটানো গেলে ভাল হত, আহত পা নিয়ে গাছে চড়ার কষ্ট করতে হত না। কিন্তু উপায় নেই। চারদিকে এত বুকে হাঁটা প্রাণী যে সাহস হয় না। কামড় না দিলেও সারারাতে এক মুহূর্তের জন্যেও স্বস্তিতে থাকতে দেবে না ওগুলো।

রাত কাটাবার জন্যে একটা চওড়া গুঁড়ির গাছ বাছাই করল ও, তারপর খরগোশের কাঁচা মাংস ও বীয়ার দিয়ে খাওয়া সেরে নিল নীরবে। একটানা

তিনদিন প্রায় অভুক্ত থাকার ফলে পেটে যেন রাক্ষস ভর করেছিল, পাউন্ড দুয়েক ওজনের প্রাণীটা দেখতে দেখতে হাওয়া হয়ে গেল। হাড়গোড়ও বাকি থাকল না।

গাছে উঠে বেল্ট দিয়ে নিজেকে বেঁধে নিল ও, গুঁড়ির সাথে পিঠ ঠেকিয়ে যতটা সম্ভব আরাম করে বসল। খিদের অসহ্য জ্বালা মিটতেই চরম ক্লান্তি ছেঁকে ধরল রানাকে, ঘুমে ভারী হয়ে এল চোখের পাতা। চোখ বোজার আগে অন্যদের কথা ভাবল রানা–রূপার কথা, মৃত সঙ্গীদের কথা, যারা পালিয়ে যেতে পেরেছে তাদের কথা, নিজের কথা।

রূপাকে শেষ পর্যন্ত লগুম্বার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অনেকগুলো মূল্যবান প্রাণের বিনিময়ে। অনেক পুরানো বন্ধুকে হারাতে হয়েছে রানাকে। এতজনের বিয়োগ যন্ত্রণা ওকে কতদিনে মুক্তি দেবে···

একটা গেছো সাপ সরসর করে নেমে এল ওপর থেকে। ওর নাকের সামনে মুখ এনে লক্‌লকে জিভ বের করে গন্ধ শুঁকল। ভাল মনে না হওয়ায় ঘুরল ওটা, চেনা শিকারের খোঁজে চলল।

ওদিকে অন্ধকার যতই গাঢ় হোক, টোগোর হাঁটতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছন্দে এগোচ্ছে সে, নিঃশব্দে। এ জন্যে তাকে কোন কষ্টও করতে হচ্ছে না। পা দুটোকে কেবল নিজের মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে দিয়েছে সে, তাতেই কাজ হয়েছে। এক আদিম অনুভূতি এগিয়ে নিয়ে চলেছে তাকে সঠিক লক্ষ্যের দিকে।

কর্নেল টোগো জানে তার শিকার কাছেই কোথাও আছে। খুবই কাছে। অন্তর থেকে নির্দেশ পেয়ে আচমকা থেমে দাঁড়াল সে, অপেক্ষায় থাকল। এখন আরও কাছে রয়েছে তার শিকার। সে জানে। সে জানে কোথায় আছে, সেটাও যে-কোন মুহূর্তে জানান দেবে তার অনুভূতি।

একটা গাছের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল লোকটা। ভাবের দোলায় সামনে পিছনে দুলছে একটু একটু, নিজেকে একাত্ম করে দিতে চাইছে অন্ধকারের সাথে। বোধশক্তির সাহায্যে চারদিক দেখতে, অনুভব করতে চেষ্টা করছে। কান পেতে গেছো ব্যাঙের ডাক ও শিকারী পাখির উল্লাস শুনছে। শিকার ধরার আনন্দে চেঁচাচ্ছে ওরা।

মাটিতেও লড়াই চলছে অনবরত। বড় বড় শিংওয়ালা গুবরের দল খোদ শয়তানের মত চেহারাওয়ালা বৃশ্চিকের সাথে মরণপণ লড়াইয়ে ব্যস্ত। দল বেঁধে লড়ছে ওরা। গাছের ফোকরে ফোকরে হানা দিচ্ছে গিরগিটি জাতীয় সরীসৃপের দল, মুখ ভরে বোলতার লারভা খাচ্ছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে একদল শিকার করছে, অন্য দল শিকার হচ্ছে। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করছে ওরা।

এত ঘটনার মধ্যে থেকেও রানা কিছুই টের পাচ্ছে না। ও এখন সম্পূর্ণ অন্য জগতে। সেটাই কাল হলো শেষ পর্যন্ত। পাশের গাছে এক বনবেড়াল কিছু একটা শিকার করল, সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের গাছ থেকে কয়েকশো বাঁদর একযোগে ভয়ঙ্কর চেঁচামেচি শুরু করে দিল। এমন চেঁচামেচি যে মরাও জেগে উঠবে। ধড়মড় করে জেগে উঠল রানা।

নিজের রাইফেলটা কোলের ওপর আড়াআড়ি রেখেছিল ও, নড়তেই পিছলে গেল ওটা। ঠেকানোর সময় পাওয়া গেল না, সশব্দে মাটিতে আছড়ে পড়ল ভারী রাইফেল। সঙ্গে সঙ্গে সটান সোজা হয়ে গেল কর্নেল টোগো, একদম স্পষ্ট শুনেছে সে আওয়াজটা। ওটা যে রাইফেলের পতনের আওয়াজ, গাছের সাথে ধাতুর সংঘর্ষের শব্দ শুনে তাও বুঝে ফেলেছে। দ্রুত পায়ে এগোল টোগো, প্রেতের মত নিঃশব্দ পদক্ষেপে। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আরও গাঢ় একটা কাঠামো, ক্ষণে আছে ক্ষণে নেই। হাসছে নীরবে।

ওদিকে আওয়াজটা কানে যাওয়ামাত্র পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল রানা, নিজের কোল খালি দেখে বুঝে নিল যা বোঝার। বেকুবের মত বসে আছে ও। এক ঝট্‌কায় বাঁধন খুলে ফেলল রানা।

দ্রুত নামতে শুরু করল। কিন্তু ফুট দশেক নামতেই গুঁড়ি থেকে বেরিয়ে থাকা একটা ডালে বেমক্কা গুঁতো খেয়ে গুঙিয়ে উঠল। সামান্য দূরে ওর তরফ থেকে আরেকটা শব্দের আশায় উৎকর্ণ টোগোর মুখে হাসি ফুটল আবার। সে জানে আওয়াজটা কোন জন্তুর মুখ থেকে বের হয়নি। কোমরের ওপরের অংশ সামনে ঝুঁকিয়ে এগোল আফ্রিকান।

নিচে এসে একে-৪৭টা সনাক্ত করতে দু'সেকেন্ড লাগল, ওটা তোলার জন্যে ঝুঁকল রানা, পরক্ষণে জমে গেল। ভয়ের শীতল একটা ধারা বয়ে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। বিপদ! খুব পরিচিত এক অনুভূতি—এর অর্থ জানা আছে ওর। পিছন থেকে কেউ লক্ষ করছে। এখন মুহূর্তের সামান্য ভুলও নিশ্চিত মৃত্যু ডেকে আনবে।

অপ্রস্তুত হয়ে ক্ষণিকের জন্যে থমকে গিয়েছিল রানা, সামলে নিয়ে আবার ঝুঁকল, রাইফেলটা ধরে চোখের পলকে ওটার ওপর দিয়ে এক গড়ান দিয়ে একটা গাছের আড়ালে চলে গেল। পরমুহূর্তে কানের পর্দা ফাটানো শব্দে হুঙ্কার ছাড়ল টোগোর রাইফেল। গুলিটা কয়েক ইঞ্চির জন্যে মিস্ করল রানাকে।

দৌড়ে এগোল টোগো। জানে সে ব্যর্থ হয়েছে। কি করে শয়তানটা তার উপস্থিতি টের পেয়েছে তা অবশ্য জানে না, জানতে চায়ও না। ওকে খতম করাই তার আসল ও একমাত্র কাজ। এদিকে শিকার এত কাছে, কাজেই লোভ সামলাতে না পেরে ডিফেন্স নেয়ার কথা ভুলে গোঁয়ারের মত ছুটে এল লোকটা।

অন্যদিকে ব্যস্ত হয়ে কালাশনিকভের বোল্ট টানার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু হলো না। আছাড় খাওয়ায় জ্যাম হয়ে গেছে। দৌড়ের ওপর ওর বোল্ট টানাহ্যাঁচড়ার ধাতব আওয়াজ শুনে হাসি চওড়া হলো টোগোর। এইবার! এইবার খতম করবে সে হারামজাদাকে।

খানিক টানাটানি করে হাল ছেড়ে দিল রানা, অস্ত্রটা উঁচু করে ধরে গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারল টোগোর পায়ের শব্দ লক্ষ্য করে। ভারী বাঁট উড়ে এসে দড়াম করে আছড়ে পড়ল তার মুখের ওপর, এক ধাক্কায় আধ ডজন দাঁত হারিয়ে যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল কর্নেল, চিত হয়ে পড়ে গেল।

কি ঘটে গেল ভালমত বুঝে ওঠার আগেই নিজের অস্ত্রটা হারাল সে। একটা শক্তিশালী হাত ঝট্‌কা মেরে কেড়ে নিল ওটা, আরেক হাত ঘাড় ধরে হ্যাঁচকা টানে

মাটি থেকে তুলে ফেলল তাকে, গাছের গুঁড়ির ওপর আছড়ে ফেলল। মাথাটা ভীষণ জোরে ঠুকে যাওয়ায় আবার গুঙিয়ে উঠল সে। ওভাবেই তাকে ধরে রাখল রানা, ঘাড় মট্‌কে শেষ করে দেয়ার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করে রাইফেল দিয়ে ভয়ঙ্কর এক গুঁতো মারল উরুসন্ধিতে।

আছড়ে পড়ে 'দ' হয়ে গেল টোগো, দু'হাতে জায়গাটা চেপে ধরে কুঁকড়ে আরও ছোট হয়ে গেল। গড়াগড়ি করতে লাগল অসহ্য যন্ত্রণায়। রাইফেলের স্ট্র্যাপ খুলে লোকটাকে দ্রুত পিছমোড়া করে কষে বাঁধল রানা, তারপর বেল্ট দিয়ে বাঁধল পা। দেহটা ওখানেই ফেলে রেখে গাছে উঠে পড়ল।

সূর্যের আলো মুখে পড়তে ঘুম ভাঙল রানার, নিচে তাকিয়ে দেখল একই জায়গায় পড়ে আছে কর্নেল। চোখ বন্ধ। ঘুমিয়ে আছে হয়তো। রক্তে সারামুখ মাখামাখি হয়ে আছে।

কিন্তু না, ওর গাছ থেকে নেমে আসার শব্দে চোখ মেলল টোগো। চিত হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে পা দুটো লম্বা করল একটু, অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে।

পা থেকে বেল্ট খুলে নিয়ে কর্নেলকে টেনে তুলল, তার গলায় বাঁধল ওটা। 'চলো এবার। যাওয়া যাক।'

আগে আগে চলল রানা। থেকে থেকে বেল্টে টান মারছে, হুমড়ি খেতে খেতে এগোচ্ছে কর্নেল। সমস্ত বেইজ্জতী নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে; শত্রুর কাছে করুণা ভিক্ষা করে তাকে কোনরকম সন্তুষ্টি দিতে রাজি নয়।

দুপুরের দিকে একটা ঝরনা দেখে পানি খেতে থামল ও। কর্নেলকে হাত মুখ ধুয়ে পানি খেয়ে নেয়ার সুযোগ দেয়া হলো। পানিতে নিজের গোটা ছয়েক দাঁত হারানো বীভৎস চেহারাটা দেখল টোগো, কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। মুখ ভাল করে ধুয়ে পেট ভরে পানি খেয়ে উঠে পড়ল। আবার শুরু হলো হাঁটা। আজও যে গতদিনের মত অসহনীয় গরম পড়েছে, বনের মধ্যেই সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেল রানা। খোলা জায়গায় পড়লে কি দশা হবে ভেবে আতঙ্ক বোধ করল।

ঝরনা ছেড়ে আসার এক ঘণ্টা পর খোলা জায়গায় পড়ল ওরা। রোদ লাগতে চামড়া যেন ঝলসে গেল। এরমধ্যে কতদূর হাঁটতে হবে কে জানে, ভাবল রানা। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা বা বিশ্রাম কোনটাই জোটেনি বলে ক্ষতটা খারাপের দিকে মোড় নিতে শুরু করেছে। টান লাগলেই আপনাআপনি মৃদু গোঙানি বেরিয়ে আসছে ওর মুখ দিয়ে।

কর্নেল টোগো কথা বলে উঠল এই সময়। 'এক কাজ করো,' থেমে দাঁড়িয়ে বলল সে। 'আমাকে মেরে রেখে চলে যাও তুমি। আমি মরতে প্রস্তুত।'

'তুমি তাহলে কথা বলতে জানো!' বলল রানা।

'হ্যাঁ। চলে যাও, মিস্টার। আমাকে দিয়ে তোমার কোন লাভ হবে না। আমাকে মেরে রেখে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'আমি অনর্থক মানুষ খুন করায় অভ্যস্ত নই,' ও বলল। 'কিন্তু তুমি কেন আমার পিছু নিয়েছিলে বলো দেখি? নিজের এতজন সঙ্গী প্রথম অ্যামবুশেই যখন

মরল, তখন কেন ফিরে গেলে না তুমি? নিজের এই পরিণতি কেন ডেকে আনতে গেলে?'

থেঁতলে যাওয়া ঠোঁট দু'পাশে সরে গেল কর্নেলের, দাঁতহীন লাল মাড়ি বেরিয়ে পড়ল। হাসছে। 'জীবনে কখনও, কারও কাছে হার স্বীকার করিনি আমি। সব কিছুতে জয়ী হওয়াকে জীবনের মূল ব্রত ধরে নিয়েছিলাম, তাই। ভেবেছিলাম এক সময় না একসময় ঠিকই তোমাকে ধরব, কিন্তু...'

'খুবই অনুগত সৈনিক তুমি, বলতেই হয়।'

'একদম উল্টো,' মাথা নাড়ল কর্নেল। 'তুমি না মারলে দু'দিন পর ব্যাটাকে আমিই মারতাম। ক্ষমতা দখল করতাম। কাজেই সেজন্যে নয়।'

'তাহলে!' লোকটার ভেস্তে যাওয়া ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা শুনে বিস্মিত হলো রানা। 'তাহলে কিসের জন্যে?'

শ্রাগ করল কর্নেল টোগো। 'তুমি আমার অনেকদিন ধরে, অনেক যত্নে সাজানো প্ল্যান বরবাদ করে দিয়েছ। তাছাড়া লগুম্বার মত মানুষকে যে তার দুর্গে ঢুকে খতম করে রেখে আসতে পারে, সে যে একদিন আমাকেও খতম করবে না, তার গ্যারান্টি কি? কে চায় এমন অচেনা শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখতে? তা যখন হলো না, তখন আর বেঁচে থেকে লাভ কি?' বলে চলল কর্নেল। 'সেই ডাচ এয়ারস্ট্রিপ থেকেই মৃত্যুর জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে আছি আমি। তাই তো একা হয়ে পড়ার পরও তোমার পিছু ছাড়িনি।'

'দুঃখিত,' মাথা নাড়ল রানা। 'শত্রু হলেও অসহায়, নিরস্ত্রকে কখনও হত্যা করি না আমি। হাঁটো।'

আরও এক ঘণ্টা হাঁটার পর কেমন একটা অনুভূতি হলো রানার। ওদের চারদিকের উত্তপ্ত বাতাসে একটা কম্পন উঠল যেন, যদিও নিশ্চিত নয় তবু মন বলল ধারণা মিথ্যেও নয়। এক মিনিট যেতে না যেতে সত্যি হলো ব্যাপারটা। একটা এইচইউ-ওয়ান-বি দেখতে পেল ওরা. প্রকাণ্ড এক যন্ত্র ফড়িঙের মত এদিকেই আসছে কোনাকুনি।

ওটার নাকে পেইন্ট করা আছে জিম্বাবুয়ের জাতীয় পতাকা। পাইলটের পাশের সীটে বসা কেউ একজন জানালা দিয়ে হাত বের করে নাড়ছে। বন্দীকে নিয়ে একদম খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল রানা. ওটার অবতরণের অপেক্ষায় থাকল। কাছে এসে পড়ল এইচইউ. কিন্তু তখনই ল্যান্ড করল না। চারদিকে কয়েকটা চক্কর দিয়ে যখন নিশ্চিত হলো কোথাও শত্রু বাহিনী ওত পেতে নেই, তখন উচ্চতা কমাল পাইলট। ধুলোর মেঘ ছড়িয়ে ল্যান্ড করল।

রোটরের গতি কিছুটা কমতে প্যাসেঞ্জারস ডোর খুলে গেল, লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল রূপা। তারপর সুমন্ত এবং সবশেষে মেজর ফরবস্। পরের দুজনের হাতে অটোম্যাটিক অস্ত্র প্রস্তুত।

রানার দু'হাতের মধ্যে এসে ব্রেক কষল রূপা। হাসি আর ধরে না মুখে। উত্তেজনায় ভরাট বুকটা ঘনঘন ওঠানামা করছে। 'রানা!'

মৃদু হাসল ও জবাবে. ঝটপট কপ্টারে উঠে পড়ল সবাই. ভেসে পড়ল

কপ্টার। ঝাঁকি খেতে খেতে দৌড় লাগাল ফিরতি পথে। রোটরের গর্জনে শোনা যায় না কিছু, তবু রূপার কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচাল রানা। 'হ্যানস! হ্যানস কেমন আছে?'

হাসি মুছে গেল সবার মুখ থেকে, কথা নেই। বুঝে নিল রানা, মুহূর্তের জন্যে মনে হলো হৃৎপিণ্ডের কাজ থেমে গেছে বুঝি। আর একটি কথাও বলল না ও, সবাই দেখল, বড় বড় পানির ফোঁটা নামছে দুর্ধর্ষ মাসুদ রানার চোখ দিয়ে। লুকাবার চেষ্টা নেই। অনেকক্ষণ পর থামল চোখের জল। আরও একজন গেল, আত্মার আত্মীয়, বিশেষ একজন।

সবাইকে নীরব দেখে রানার দিকে ফিরল টোগো, বুঝল ব্যাপারটা, হাসতে শুরু করল। একটু একটু বাড়ছে হাসির তোড়, মাথা ঘনঘন ওপর নিচ করছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করল লোকটা। 'যাক্, আমি তাহলে একাই হারিনি,' বলল সে। 'তুমিও হেরেছে, মিস্টার। হিসেব করলে দেখা যাবে শেষপর্যন্ত আমিই জিতলাম। কারণ সব হারিয়েও আমি হাসতে পারছি, তুমি কাঁদছ।'

আবার হা-হা করে হেসে উঠল সে উন্মাদের মত। তাকে চড় মারার জন্যে হাত তুলল সুমন্ত, কিন্তু সময় পেল না। তার আগেই খপ্ করে লোকটার ঘাড় চেপে ধরল রানা, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই অন্য হাতের দ্রুত ঝাপ্টায় কপ্টারের স্লাইডিং ডোর খুলে ফেলল, তারপর ঘাড় ধাক্কার সাথে মেরুদণ্ডের ওপর ভয়ঙ্কর এক লাথি মেরে নিচে ফেলে দিল তিন হাজার ফুট উঁচু থেকে। উন্মত্তের মত হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে খুব দ্রুত পড়তে লাগল কর্নেল টোগো, কড়া রোদের আলোয় ভাজা হওয়া শক্ত মাটিতে মাথা দিয়ে আছড়ে পড়ল।

দড়াম করে দরজা লাগিয়ে বসে পড়ল রানা। চেহারা একদম নির্বিকার, যেন কিছুই হয়নি। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল মেজর ফরবস্, কিন্তু ওর সাথে চোখাচোখি হতে মত পাল্টাল।

রানার ভয়ঙ্কর রকম শীতল চাউনি দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠেছে তার বুকের মধ্যে। মনে হলো কে যেন এইমাত্র তার কবরের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল।

ওদিকে রূপা, সুমন্ত ও পাইলট, সবাই স্থির। ভাব করছে যেন কেউ কিছু দেখেনি।

মাটিতে নিজের গাঢ় রঙের বড়সড় ছায়া ফেলে দ্রুত উড়ে চলল কপ্টার।

***